মুখতার আউয়েজভ (১৮৯৭—১৯৬১) — সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার অন্যতম প্রজাতন্ত্র কাজাখস্তানের বিখ্যাত লেখক ইনি। চিরায়ত কাজাখ উপন্যাসের পুরোধা, ভাষাতাত্ত্বিক, আকাদেমিশিয়ান মুখতার আউয়েজভের নাম ইউরোপ এশিয়ার অনেক দেশেই সুবিদিত। তাঁর সারা জীবনের মহাকীর্তি হল কাজাখস্তানের লোক কবি আবাই কুনানবায়েভকে নিয়ে লেখা, লেনিন পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'আবাই', অনেক বিদেশী ভাষাতেই এটি অনূদিত হয়েছে।

'স্তেপের লেঠেল' কাহিনীটি তিনি শেষ করেছিলেন মৃত্যুর কিছু আগে। বাস্তববাদী শিল্পগুরুর পাকা হাতে এটি লেখা হয়েছে অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে কাজাখ জনগণের জীবন নিয়ে।

ম. আউয়েজভ

স্তেপের লেঠেল

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা ও চিত্রাঙ্কন: ভ্লাদিমির ইলিউশেচেঙ্কো

Мухтар Ауэзов

ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ

Повесть

На языке бенгали

১

তাড়াতাড়ি করে বিছানা পাতছিল বৌ। ছোটো ভাইটিকে শিশুর মতো কোলে তুলে বড়ো ভাই বললে:

'হাড় মাস ওর কিছুই আর নেই, একেবারে শুকনো খড়ের আঁটি... কী হাল হয়েছে বাহাদুরটার!'

ধূসর মাটি লেপা দেয়ালের শীতের ডেরা, তারই মেটে মেঝের ওপর তিন-চার ভাঁজ করা কম্বলের বিছানা। সাবধানে কাত করে শুইয়ে দেওয়া হল রোগীকে।

একেবারে নির্জীব হয়ে পড়েছিল রোগী, কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, রক্তহীন ঠোঁটদুটো থরথরও প্রায় করছিল না। দাদা বৌদি ঝুঁকে এল তার মুখের দিকে। রোগীর কথাগুলো ঠিক কানে এল না, তবে ঠাহর করলে:

'দুবলা ঘোড়া, ঝামেলাই সার ...'

'দুবলা মরদ মানুষের বাড়,' ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলে প্রবাদের পরের পঙক্তিটা যোগ করলে বৌ।

দাদার নাম বাখতিগুল, ছোটো ভাইয়ের নাম তেকতিগুল, বৌয়ের নাম হাতশা।

বাখতিগুলের কালো মোচ, ভারী কাঁধ, চওড়া বুক, মাথা নিচু করে সে বসলে রোগীর পাশে। গত শরতেও তেকতিগুলের পালোয়ান চেহারা দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত। দাদার

চেয়েও সে ছিল মাথায় লম্বা, গাঁট্টাগোঁট্টা। মুখপোড়া ব্যাধিতে ওকে শেষ করে ফেলেছে। জখম থেকে খুনের মতো সব তাকৎ নিঃসৃত হয়ে গেছে ছোকরার।

আগে ন্যাড়া পাথরেও ওর নরম লাগত, আজ বিছানাতেও কষ্ট। খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে। ঘন ঘনই বলে বিছানা বদলাতে। কোলে তুলতে আজ এতটুকুও কষ্ট নেই। অথচ আগে ঠেলে তোলে কার সাধ্যি!

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় সেই ভয়ঙ্কর বছরটায় আজকের মতোই ভাইকে বইতে হয়েছিল বার্খাতিগুলকে। বড়ো ভাইয়ের তখন ষোলো, ছোটটির দশ। আগুনের মতো সারা স্তেপে, আশেপাশের সব আউলেই ছড়িয়ে পড়েছিল টাইফাস মড়ক। একই দিনে শয্যা নিল মা আর বাবা, একই দিনে মরল, সকালে মা, রাতে বাবা। নিজেদের আউল ছেড়ে যেদিকে চোখ যায় পালিয়েছিল দুই ভাই, মরবার সময় সেই উপদেশই দিয়ে যায় বাবা। ছোটো ভাইয়ের পা আর যখন চলে না বড়ো ভাই তখন তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল টিলার ওপাশে, যতদূরে যাওয়া যায় আর কি। মরণ থেকে, মহামারীর তাড়া থেকে সেদিন বার্খাতিগুল ভাইকে বাঁচিয়েছিল, কিন্তু আজ... নিয়ে যাবে কোথায়?

তেকতিগুল নেতিয়ে পড়ছে খেদে — সে খেদ জোয়ানের নয়, মরণের।

‘কেটে ফেলা ডালে পাতা কি আর ফলে!’ কখনো দাদা কখনো বৌদির দিকে নিষ্প্রভ ঘোলাটে ভীত চোখে চেয়ে সে বললে, ‘এতিম আমরা, এ সবই আমাদের অভাব অনটনের

ফল। লোকে তো আমায় মারলে না দাদা, মারলে অভাবে। আমি ছাড়া কি করে চলবে তোমাদের?'

একটা খিঁচুনিতে বেঁকে গেল তার ফ্যাকাশে ঠোঁট, ঠিক যেন বুক ফেটেই বেরিয়েই এল তার মনের কথাগুলো:

'ওহ্, যদি একবার শোধ নেওয়া যেত... মরণের জন্যে নয়... অপমানের জন্যে...' নির্মম একটা ক্রোধে জ্বলে উঠে ফিসফিসিয়ে বললে সে। কাসলে কুঁথে কুঁথে, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, ঠিক যেন এক থুত্থুড়ে বুড়োর মতো।

হাতশা আজ আর সইতে পারল না, কান্না নিয়ে ককিয়ে উঠল সে:

'পাষণ্ড সব, হাত-পা তোদের শুকিয়ে যাক লক্ষ্মীছাড়া! মারলে গো, ছেলেটাকে একেবারে মেরে শেষ করলে... একটা মরা ছাগল দিয়েও দাম মেটালে না! রোগীর পথ্যের জন্যে এক মুঠো দান যদি বা দিত!'

বাখতিগুল কথা বলে কম।

'দান?' একটা ভয়ংকর ব্যঙ্গের ভাব করে সে বললে, মোটা কালো গোঁপের প্রান্তদুটো ঝুঁকে পড়ল নিচে।

স্বামীর মনের কথাটা বুঝলে হাতশা। পাষণ্ডদের না আছে মায়া, না আছে দয়া, না আছে একটু কৃতজ্ঞতা। দানের জন্যে হাতটা তো বাড়াবেই না, চোখ তুলেও চাইবে না! জানে ওরা, অসুখ লোকটাকে, রোগীটাকে খাওয়ানোর মানেই হল দোষটা মেনে নেওয়া... তেকতিগুল যদি বেঁচে না ওঠে? তাহলে যে স্তেপের সাবেকী কানুন অনুসারে খুনের জন্যে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এই হল ওদের ভয়।

ধনীরা ন্যায় আচরণ করেছে এমন একটা দিনও জীবনে বাখতিগুলের মনে পড়ে না, আর চোখের সামনে মা-বাপকে মরতে দেখার পর এ তো তার দ্বিতীয় জীবন।

সেই সর্বনাশের বছরটায় টাইফাস থেকে পালিয়েছিল পলাতকেরা, পালাতে পারে নি কপাল থেকে। বহু ঘোরাঘুরির পর ওরা মায়ের দিক থেকে এক দূর সম্পর্কের মামার কাছে আশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু সুখ পায় নি। বুর্গেন ভলোস্তে ভ্রাম্যমাণ কজিবাক বংশের এক ধনী আউলে রাখাল হয়ে কাজ নেয় ছেলেদুটি। সালমেন বাইয়ের জন্যে ন্যায় মতে ধম্ম মতে দু'ভাই খেটে আসছে আজ অনেক দিন, গত শরতে তার কুড়ি বছর পুরেছে। সালমেন হল কজিবাক বংশের ছোট কর্তা।

চাকরিতে বাখতিগুল মর্যাদা পেয়েছে অনেক — হয়েছে ঘোড়া পালের কর্তা — রাখালদের মধ্যে এটা বেশ উঁচু আসন সত্যি, তবে ধন তার বাড়ে নি। তার বদলে ধন বেড়েছে তার মনিবের। বাখতিগুলের নিপুণ হাত দিয়ে স্তেপে বাইয়ের কম ঘোড়ার পাল যায় নি, খাসা খাসা তেজীয়ান ঘোড়া সে পালন করে তুলেছে শত শত।

ছোট ভাই তেকতিগুলকে বাই লাগিয়েছিল ঘুড়ির দুধ দোয়ার কঠিন কাজে। বছরের পর বছর কাটল, পেরিয়ে গেল নিরানন্দ তারুণ্যের জীবন, কিন্তু বদলাল না কিছুই: দিনে তেকতিগুল ঘুড়ির দুধ দুইত আর রাতে পাহারা দিত ভেড়ার পাল।

বাখতিগুলের কপালটা ছিল ভালো — যতই হোক, বাই তার বিয়েটাও দেয়। পাশের আউলের এক রাখালের কন্যে

হাতশাকে বৌ করলে সে, আর সেই থেকে হাতশাও তার স্বামীর মতোই বাই সালমেন, তার বৌ, তার মায়ের বাঁদীগিরি করতে লাগল। বিয়ে করতে গিয়ে প্রায় দশ বছরে বাখতিগুলের যা জমেছিল সবই গেল, তবে বাইয়ের যা মর্জি। এইতো তেকতিগুল তিরিশ বছরে পড়েছে, আজো তো বিয়ে হয় নি।

ক্ষেতমজুর দু'ভাইকে চিনত এলাকার সব লোক, সাহস আর শক্তিতে নাম ছিল তাদের, কিন্তু তা থেকেও বাইয়েরই হত লাভ।

কজিবাক বংশটা ধনীর বংশ, সেইজন্যেই লোভী, ক্ষমতাপিপাসু, কিছুতেই আর তাদের তৃপ্তি হয় না। 'বারিমতা'র জন্যে বহুকাল থেকেই তারা ডাকসাইটে, অর্থাৎ বিপক্ষের ছাউনির ওপর হামলা চালিয়ে ঘোড়া ভেড়া সব লুটে নিয়ে আসত তারা। আর এ ব্যাপারে বাখতিগুল আর তেকতিগুল ছিল প্রধান ভরসা।

হাতে কালো লাঠি দিয়ে বাছাই করা ঘোড়ায় চাপিয়ে গোপন হামলায় পাঠানো হত তাদের। দু'ভাই বাইকে সেলাম করে যাত্রা করত যেখানে হুকুম হত।

কর্তা সালমেনের বড়ো ভাইয়ের নাম সাত বাই, ভলোস্তের সরকারী শাসকের পদের জন্যে বার বার ঝগড়াঝগড়ি, দলাদলি বাধাত সে, শত্রুতা উসকিয়ে তুলত, আর ঘোলা জলে নিজে ধরত মাছ। লাঠি পেটা করে হাড় ভাঙা হত সওয়ারীদের, ভলোস্ত হাকিমের পদ পাওয়ায় সাত বাইয়ের মর্যাদা বাড়ত, আর ওদিকে সালমেন বাইয়ের ঘোড়ার পালের শ্রীবৃদ্ধি হত।

অন্য বংশের সওয়ারীরা ভয় করত বাখতিগনল আর তেকতিগনলকে, ঈর্ষা করত তাদের জোর দেখে:

'লোক নয় হে, কালো ডাণ্ডা...'

ঠাট্টাও করত মাঝে মাঝে:

'চাকর তো নয়, গোলাম... গোলাম নফর!'

বেপরোয়া বলে নামডাক, তবে আনন্দ নেই তাতে। ছাই নাম। পরের আউলের কথা যাক, নিজেদের আউলেই তো বৌয়েরা ছেলেরা ফিসফিসিয়ে বলে:

'চলল ওরা লড়াইয়ে, বারিমতায়, প্রথামতো... ফিরল ওরা মাঝরাতের লনট নিয়ে...'

তবে বাই ছিল খনসি! বাইয়ের রাজ্যে বাস, সবই তার মর্জি।

বছর থেকে বছরে, শীত থেকে গ্রীষ্মে, কজিবাকদের ধনসম্পদ উছলে ওঠে। বাখতিগনল তেকতিগনলের খাটা-খাটনি তো আর খামোকা যায় না। রাখাল দন'ভাইয়ের হাতের লাঠি ছোটো নয়, ঘোড়া ধরার ফাঁস খাটো নয়, তবে মনের জোরটাই কম। কুড়ি বছর উড়ে গেল, মনখে তাদের রা নেই, কাজকম্মে খনঁত নেই।

বাই সালমেন তাদের মজনরি কিছন দিত না। স্তেপের রীতি চুক্তি করা: এত দিনের খাটুনি হলে এই এই পোষাক, এই এই ঘোড়া ভেড়া। দন'ভাইয়ের সঙ্গে তেমন কোনো চুক্তি ছিল না বাইয়ের, সালমেনের খামারে বাপন অমন আবদারের ঠাঁই নেই। বাই যে তার গোলামদের মা-বাপ। মায়ের দিক থেকে হলেই বা, একই বংশেরই তো লোক তারা। ঘরের লোককে কি আর মজনরি দেয়, সিধে খয়রাত দেয়।

তাই তিরিশ বছর বয়সেও তেকতিগ্বলের এমন কিছ্ব ছিল না যেটা সে বলতে পারত আমার। তবে বাখতিগ্বল আর হাতশার ছিল কিছ্বটা...

প্বরনো অপরিসর একটা ইয়্বর্তা*, তিন চারটে ঘোড়া, গোটা দশেক ভেড়া — এই সম্বল! তিনটি শক্তসমর্থ করিতকর্মা মান্বষের বহ্ব বছরের চেষ্টা চরিত্র, হাড় ভাঙা খাটুনি আর প্রাণের ঝ্বঁকির পর এই তাদের সব।

খোদার মর্জি, শ্বধ্ব ধনীদের যদি একটু ন্যায়জ্ঞান থাকত, সালমেনের ব্বকটা যদি অমন শ্বয়োরে ব্বক না হত।

বিপদটা এল গত শরতের এক ঝোড়ো হাওয়ার বাদলা রাতে। চেঁচামেচি কান্নাকাটি গালাগালি উঠল আউলে। বাখতিগ্বল তখন স্তেপ থেকে ঘোড়া চরিয়ে ফিরছিল। সালমেন বাই দাপাদাপি লাগিয়েছিল আউলে, চিৎকার করছিল, থ্বথ্ব ছিটাচ্ছিল উটের মতো, হাতের কাছে যাকে পাচ্ছিল তাকেই কষছিল চাব্বক। চোখে জল নিয়ে হাতশা নিভন্ত চুল্লির পাশে শ্বয়ে ফিসফিসিয়ে কথা কইছিল তেকতিগ্বলকে নিয়ে।

'কোথায় যে গেল?'

'খোদা জানেন ...'

'বেঁচে আছে তো?'

'খোদা জানেন ...'

অবশ্য স্তেপেই ছিল সে। ব্যাপারটা এই: ঝড় ওঠায় ভেড়ার পালটা এলোমেলো হয়ে যায়, দিগ্বিদিকে ছ্বটে পালায়

---

* ইয়্বর্তা — ছাউনিবিশেষ। — সম্পাঃ

আউল থেকে। তেকতিগুল কিন্তু তার পেছু ধাওয়া করে নি, আর বাই যখন চাবুক নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসে, তখন জীবনে এই প্রথম ধৈর্য হারাল সে, বাইয়ের চর্বিডোবা চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললে:

'রাতটা কেমন দেখুন... গায়ে কিছু নেই, খালি পা! চেকপেনটা* শুধু সম্বল, সেটাও ঘামে পচা, খসে খসে পড়ছে... গা ঢাকার জন্যে অন্তত পুরনো একটা কোর্তাও নয় দিন।'

সালমেনের কাছে এটা অপ্রত্যাশিত, থতমত খেল সে।

'ভেড়াগুলো মরছে... কত বড়ো পাল!.. আর তুই দরাদরি লাগিয়েছিস?'

'আমি চাইছি গো... দয়া করুন...'

'কুত্তা কাঁহিকার! নিজের চামড়া বাঁচাতে চাস!'

তেকতিগুল তিক্ত উপহাস করল:

'নিজের চামড়াটাই যে আমার শেষ সম্বল...'

'তবে তোর তিন ফালি চামড়াই তুলি দাঁড়া!'

বাইয়ের ইশারায় তার পাঁচজন পালোয়ান ঝাঁপিয়ে পড়ল তেকতিগুলের ওপর, মাটিতে ঠেসে ধরল তাকে, আর বাই নিজে খেপার মতো বুটের লাথি মারতে লাগল তার বুকে, ভাগাল তাকে স্তেপে। তেকতিগুল বশ মানলে, লজ্জায় মাথা হেঁট করে ভোঁতা একটা যন্ত্রণা নিয়ে সে চলে গেল। বললে:

'গুনাহ হবে আপনার...'

---

* চেকপেন — উটের লোমের আলখাল্লা। — সম্পাঃ

ক্রুদ্ধ গালাগালি দিয়ে বাই তাকে বিদায় দিলে।

লোকে ভয়ে ভয়ে এক দৃষ্টে চাইলে তেকতিগুলের দিকে। বাইয়ের নাল মারা বুটে তার চেকপেনটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে, ঝুলছে ফেঁসে ফেঁসে, লোম খসার সময় উটের কেশর যেমন দাঁড়ায়। সবাই কিন্তু চুপ করে রইল, আর বাই চোটপাট করে গেল, চাবুক হাঁকিয়ে ক্ষেতমজুরকে ভাগাল...

সালমেনকে এক ঘুষিতেই যমালয়ে পাঠাতে পারত তেকতিগুল, কিন্তু ক্ষেতমজুরের চিন্তাতেও সে কথা আসে না। এ কথাটা তার মনে হয়েছিল অনেক পরে, যখন নিজেই সে মৃত্যু শয্যায় শুয়েছে।

হাতশাকে ঘোড়ার পালটা দেখতে বলে বাখতিগুল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল স্তেপে, ভাইকে ডাকতে ডাকতে। আশেপাশের ঢিবি-টিলা খাল-খন্দ ঘুরে ঘুরে দেখলে, জড়ো করলে ভেড়াগুলোকে, কিন্তু ভোর পর্যন্ত তেকতিগুলকে খুঁজে পেলে না। যখন খুঁজে পেলে, ঝড় জল থেকে নিজের গা দিয়েই ওকে আড়াল করে ঘোড়ার পিঠে চাপাল, তখন তেকতিগুলের জীবন্মৃত অবস্থা।

হাতশা ঘোড়ার পালটা আয়ত্তে রাখতে পারে নি। ঝড়ে ঘোড়াগুলো ঠিক ভেড়ার মতোই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। দু'ভাই আউলে ফিরতেই কর্তার নিষ্ঠুর দণ্ড নেমে এল। ছোটো ভাইয়ের তখন আর সাড় নেই, প্রচণ্ড জ্বরে ভুল বকছে, দাদা তাকে বাঁচাতে পারলে না। হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই দিয়েই পেটা হল তাদের, এতটুকু দয়া না করে, চোর পিটুনির মতো।

এ রাতের পর দু'ভাই সালমেনকে ছেড়ে যায়। সামান্য চাটি বাটি যা ছিল গুটিয়ে তারা কজিবাকদের আউল ছেড়ে চলে যায় পাশের চেলকার ভলোস্তে, ঠাঁই নেয় তাদের বাপের আমলের পরিত্যক্ত শীতের ডেরায়, যেটা তারা ছেড়ে এসেছিল কুড়ি বছর আগে।

কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গেই বাপের ভিটেয় এসে ঢোকে এককালের সেই টাইফাসের মতো ধীরগতি মরণ। ঢুকে সে মরণ দাঁড়িয়ে থাকে তেকতিগুলের শিয়রে।

ভাই সেই যে শুল আর উঠল না। সারা শীত সে একটা টসটসে কাসিতে ছটফট করেছে। খকখক করে দগদগে রক্ত তুলত সে, দমকে দমকে উগরে ফেলত আয়ু।

নিজের কপাল নিয়ে কখনো সে নালিশ করে নি, আর এখন মার-খাওয়া কুকুরের মতো সে দাঁত খিঁচচ্ছে। খিঁচচ্ছে কিন্তু এইজন্যে নয় যে জীবনে সে সুখের মুখ দেখে নি, বৌ নেই তার, ছেলেমেয়ের জন্ম দেয় নি, এইজন্যেও নয় যে সে মরতে চায় না। এইজন্যে যে অপমানের শোধ তুলতে সে পারল না। ছোটো থেকেই তেকতিগুল ভালো মানুষ, সরল মনের লোক, কিন্তু এখন যেন বা ঠিক ভূতেই পেয়েছে তাকে।

হাতশার কথা শুনে শীতের একদিন বাখতিগুল গেল সালমেনের ভাই সাতের কাছে। গেল সে খোলা মনেই, ভীরু ভীরু একটা নালিশ নিয়ে।

সাত ধৈর্য ধরে শুনল সবটা, মামলার সওয়ালের মতো করে যুক্তি দিয়ে বোঝাল:

'বলছিস খিদেয় মরছিস তোরা? তা ভালো যে আমার

কাছে লুকোস নি। কিন্তু সালমেনের কাছে তো আর খিদেয় মরতিস না! বলছিস, ভাইটা মরছে? তা ভালো কথা যে গুলতাপ্পি দিচ্ছিস নে। তবে খুন যদি হয় তো সঙ্গে সঙ্গেই মরে, কিন্তু এমনি মার খেলে লোকে মরে না! তুইও তো কয়েক ঘা খেয়েছিস কিন্তু মরিস নি তো? বলছিস রোগে ভুগছে? আরে এইটেই তো ব্যাপার, আসল কথা। জানিস, এ রোগ জিনিসটা কী? এ রোগে আমাদের কেই না ভোগে? সে ভয় কার নেই? সালমেন আর আমার মায়ের তো অভাব কিছু ছিল না, দুধে ঘিয়ে মানুষ, কিন্তু মরলেন তো ক্ষয়রোগেই। এতে দোষ ধরবি কার? সালমেনের নাকি আমার? কে জানে হয়ত তোর বউ হাতশারই দোষ, আমার মায়ের সেবা করেছিল তো ওই। খোদা আছেন, সবই দেখছেন, এ কথা তো বলবার নয়, কিন্তু তুই আমায় বলিয়ে ছাড়লি। এ আস্পর্ধা তোর হল কোথা থেকে? খোদার দরবারে যা পেশ করার কথা, সেটা তুই আমার কাছ থেকে টেনে বার করতে এলি এ বুদ্ধি তোকে দিল কে?'

বাখতিগুলকে আর একটি কথাও বলতে না দিয়ে সাত তাকে দূর করে দিল। মনে মনে হাতশা আর নিজেকে তিক্ত ধিক্কার দিয়ে ফিরে গেল সে।

বসন্তের গোড়ায় দিন ফুরল তেকতিগুলের। তার দেহের তাকৎটা ক্ষইতে ক্ষইতে জীবনটাও ক্ষয়ে গেল। চোখে তার অলক্ষ্যেই নিভে গেল সেই ঘোলাটে চাউনিটা।

অনেকক্ষণ শান্ত হতে পারে নি বাখতিগুল, অনেকক্ষণ ধরে সে কাঁদলে। শোক করলে চল্লিশ দিন, আর এই চল্লিশ

দিন পরে জুটল তাদের সারি বংশের গরিব কিছু আত্মীয়স্বজন। শেষ যে সম্বলটুকু ছিল তাও খরচ করে রীতি মেনে সৎকার করলে তেকতিগুলের।

সৎকারের অনুষ্ঠানে সবাই বলাবলি করলে, লোকটা ছিল সিংহ। বললে তার জ্বালাযন্ত্রণার কথা। বললে সারি বংশ অনাথ বংশ, তাদের আর বাহাদুর কেউ রইল না।

'আমার ডান হাতটা গেল…' মাথা নিচু করে মনে মনে ভাবলে বাখতিগুল, বুকখানা ওর ইয়ুর্তার মতোই ফাঁকা নাঙ্গা।

২

শরতে একটা গোপন বিপজ্জনক কাজে নামল বাখতিগুল। বেরুল সে এক নির্জন বাদলার রাতে। ছোট একটা মশকে 'মালতা' অর্থাৎ ঘন ঘোল ভরে সেটা বাঁধলে জিনের সঙ্গে, তারপর নামল পাহাড় বেয়ে। তার সঙ্গেই সঙ্গ ধরল তার বহুকালের সঙ্গী — খিদে।

যেতে যেতে ভাবছিল বাখতিগুল:

'এ শরত আমার অনেক দিনের আশা, অনেক দিনের দায়… জলের ঝিরঝির, জলের কনকনানি, জলেই ধুয়ে যাবে দাগ… কপালে থাকলে সকাল নাগাদ তিন পাহাড় পেরিয়ে নিয়ে যাব তাড়া করে! খামোকাই কি ঘুরি, খামোকাই কি চরি, খামোকাই কি পাহারায় ফিরি?'

রাতের আকাশে প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে পাহাড়গুলো। অন্ধকারে পথের রেখা চোখে পড়ে কি পড়ে না। কিন্তু পাহাড়ের

পাথুরে শিরদাঁড়া আর বন-ঢাকা পিঠ দেখা যাচ্ছিল বেশ পরিষ্কার। রাখাল তো, চোখ তার কুকুরের মতো তীক্ষ্ন। আর জায়গাটাও চেনা, যাতায়াতে জানা, ভালো লাগে জায়গাটা।

দিনের বেলায় পাহাড়গুলো দূর থেকে দেখায় যেন দৈত্যদের খাঁখাঁ করা পাথুরে ছাউনি, মরণ দিয়ে যেন তার দরজা বন্ধ। কিন্তু কাছে এলে, রাতের বেলায় তার চেহারা হয় অন্যরকম, ভয়াবহ। খাড়াই গাগুলোয় ফার গাছের বিজিবিজি এলোমেলো ঝোপগুলোকে মনে হয় যেন টানা টানা শ্বাস ফেলা কোন এক ঘুমন্ত বিকট প্রাণীর গায়ের লোম। চুড়োগুলো ঠিক যেন এক জানোয়ারের সতর্ক তীক্ষ্নাগ্র কান আর খাদগুলো যেন হাঁ করা মুখবিবর, ঠাণ্ডা পচা ভাপ উঠছে সেখান থেকে, খোঁচা খোঁচা হয়ে বেরিয়ে আছে শিলা।

কিন্তু বাখতিগুলের ভয় হয় না কিছু, পাহাড় তার আপনজন। পাহাড় তার কান জুড়োয়, মন জুড়োয়, পাহাড় তাকে কথা দেয়: এগিয়ে যা, দেরি করিস নে, আমরা তোকে লুকিয়ে রাখব।

সরু পথটা খুব ভরসার নয় তা সত্যি, বিশেষ করে শরতে, রাতের বৃষ্টিতে। কিন্তু এতটুকু দুশ্চিন্তা না করে বাখতিগুল ভরসা রেখেছিল তার ঘোড়াটির ওপর। তার সিভি মজবুত, অভিজ্ঞ ঘোড়া, খাড়াই ঢাল বেয়ে নামতে, খাদের ধার ঘেঁসে চলতে সে অভ্যস্ত। পাহাড়ে ছাগলের মতো সে ক্ষিপ্র, চটপটে। মাঝে মাঝে পথটা হয়ে এসেছে সুতোর মতো সরু, একসঙ্গে দুটো খুর আঁটবে না, কিন্তু সিভি শান্তভাবেই এগিয়ে চলল, সহজ মসৃণ তার গতি, ডান পাশের ফুলে ওঠা পাথরটায় গা

না লাগিয়ে, বাঁ পাশের অতল খাদে কটাক্ষ না হেনে চলল সে ঠিক যেন দড়ির ওপর দিয়ে।

সিভিই বাঁচাবে! সে যেন টের পাচ্ছে কোথায় চলেছে তার মনিব। আর বাখ্‌তিগুল যখন বিপদ জানিয়ে হুঁশিয়ার করে আলগোছে পা দিয়ে চাপ দেয় তার গায়ে, ঘোড়া তখন মাথা উঁচিয়ে ঘাড় ঝাঁকায়, মানতে চায় না মনিবের কথা। পিঠটা তার জিনের নিচে নরম হয়ে নেমে আসে, যেন বলতে চায়, ভয় নেই, নিশ্চিন্তে বসে থাকো, তোমায় নিয়ে যাব ঠিক, তারপর তোমার হাতযশ...

যেতে যেতে ভাবছিল বাখ্‌তিগুল, নিজের কথা, ঘোড়াটার কথা, সেখানে কাদের সঙ্গে মোলাকাৎ হবে সেই কথা:

'এমন আবহাওয়ায় খুব কি তোমাদের আনন্দ। বাদলা উঠলেই সবাই আমরা যেন হাঘরে কুকুর! চেয়ে দেখো কার নাক ভেজা, কে লেজ গুটবে... তোমরা সালমেনের লোকই হও, কি কজিবাক বংশের অন্য কেউ হও — সবই সমান! গোটা কজিবাক বংশই আমার কাছে ধারে, শোধবোধ হয় নি এখনো।'

রাত শেষ হয়ে গেল, মেঘলা ছোটো দিনের বেলাটাও মনে হল কাটতে চায় না। ভোর সকাল থেকে সন্ধ্যের প্রথম আঁধারটুকু পর্যন্ত লুকিয়ে রইল বাখ্‌তিগুল—ঘুমিয়ে রইল 'সারিমসাক্তি' অর্থাৎ রশুনগন্ধী পাইন বনে। বনটা অন্ধকার, আরণ্যক, মিষ্টি-ঝাঁঝালো গন্ধে ভরা, কিন্তু খিদেয় ঘুম এল না তার। পেটের মধ্যে তার নেকড়ের খিদে। মশকের 'মালতা' ফুরিয়ে গেল। এ কি আর পুরুষের আহার? পানীয়—সে তো গলার জন্যে, পেটের জন্যে নয়। কথায় বলে, তেষ্টা যত মরে, খিদেও তত চড়ে।

আঁধারের জন্যে আর তর সইছিল না বাখ্‌তিগুলের। একটা মাত্র স্বরই তার কানে আসছিল, তার গোপন সঙ্গী, চিরকেলে বন্ধুর পরামর্শ।

'সালমেনের লোকই হোক বা তাদের আর কেউ হোক... খোদ সাতই হোক না কেন... যেই হোক!'

জাইলিয়াউ-তে — অর্থাৎ পাহাড়ে মাঠে এখনো পালগুলোর চরার কথা। নিচে স্তেপের মাঠে পেঁছনোর সময় হয় নি এখনো। সেইখানে আকাশতলের মাঠেই মোলাকাৎ হবে আজকের রাতে... খোদা দেখবেন, কার পাপ, কার গুনাহ...

তাহলেও ভেতরে ভেতরে দ্বিধা তার কাটে নি।

'সালমেন বরং প্রথমে তার কৈফিয়ৎ দিক!' ভাবল সে, কিন্তু সে যা ভেবেছে সেটা করার আগে নিজের কাছেই কৈফিয়ৎ দিতে চাচ্ছিল সে।

'ঘরে আমার মুঠোভর কালো মিলেট...' ঘোড়ার কানে কানে বললে সে, 'সারা সংসারের জন্যে এক মুঠো... ছেলেমেয়েদের জন্যেই আসা, তাদের তো দোষ নেই...'

রাত দুপহরে ঘোড়া ছুটল তাড়াতাড়ি। সরু পথটা চওড়া হয়ে এসেছে, শিগগিরই জাইলিয়াউ এসে পড়বে। সারা বুক ভরে বাখ্‌তিগুল তার সামনের খোলা মাঠের আমেজ নিলে। চাঙ্গা হয়ে উঠল সে, ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে সোজা করে তুলল পিঠ। তার দেহে, ঘোড়ার দেহে দেখা দিল নতুন বল, নতুন সাহস।

সওয়ারীকে এখন দেখাল যেন এক বুক টান করা মস্ত ঈগল — ধীরে ধীরে যে তার পাখা মেলছে। সে পাখি এই

এলাকারই তুষার ধবল পাহাড় চুড়োর আদিবাসী, তার সম্রাট। ধীরে ধীরে ডানা মেলে সে, উঠে যায় আকাশে, ভেসে থাকে আলা-আতুর স্তূপ স্তূপ শিলা আর অতল অপার খাদগুলোর ওপর, ধারালো চোখে নজর করে তার শিকার। তারপর নিশানা নিয়ে ঠিক তীরের মতো শনশনিয়ে নেমে এসে ছোঁ মারে, বিঁধে নেয় লোহার মতো নখরে।

মাতাল করা দুরন্ত সেই মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ে গেল বাখতিগুলের, জোয়ান কালে কজিবাকদের হুকুমে সে যখন নৈশ অভিযানে বেরুত। তখন নিজেকে তার এই পাখির মতোই মনে হত। ছুটত উদ্দাম বেগে, কিছু না ভেবেচিন্তে। পাশেই থাকত তার ভাই তেকতিগুল, মনটা তার ছেলেমানুষের মতো, গায়ে পালোয়ানের জোর।

না, ঠিক অমন সোজাসুজি গিয়ে ঢুঁ মারার মতো গবেট ভেড়া ছিল না তারা! ছায়ার মতো পেছু নিতে পারত তারা, ওঁৎ পেতে থাকত, এড়িয়ে যেতে পাশ কাটাতে জানত, ঘুমন্তদের না জাগিয়ে পূর্ণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যেত, জাগ্রতদের নাকের ডগা দিয়ে গলে যেত অদৃশ্য হয়ে। ক্ষিপ্র ছিল তারা, ধূর্ত, কৌশলী। শুধু জোর দেখিয়ে কি আর জমে, জমে ফন্দিফিকিরে। তবে একরোখাও ছিল বই কি: যদি ফসকে যেত, কপালে না জুটত, তাহলে মাঝ পথ থেকেই ফিরত না, সরোষে একা একাই লড়ে যেত দুজন তিনজন প্রতিপক্ষের সঙ্গে।

অভিজ্ঞ ঈগল সে, আগের সেই তেজ যদি আজ পেত বাখতিগুল!.. না আজ আর তা নেই। বুকের মধ্যে কি যেন তার খসে গেছে, ভেঙে গেছে।

তবে ভাবার সময় নেই তার। দূর থেকেই বাখতিগুল কি একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে যেন টের পাচ্ছিল নরম ভেজা ঘাসের ওপর বহু ঘোড়ার একটা পালের ধীর গতি। পাহাড়তলির পাথুরে ঢিপিটার ওপাশে ঘোড়া চরছে, বৃষ্টির ঝিরঝির আর বাতাসের শনশন ভেদ করে তাদের শব্দ যেন কানে আসছে তার।

পাহারাওয়ালারা যদি অভিজ্ঞ হয়, তাহলে তারা ওঁৎ পেতে থাকবে পালটার কাছাকাছি, ভালো করে শব্দ শোনা যায় তাতে, ঠিক সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় আগন্তুকের ওপর। এরকম লোকদের ফাঁকি দেওয়া মুশকিল, এমন কি নিঝুম রাতেও। বাখতিগুল লাগামটা টেনে ধরল, সতর্ক রইল সিভি যেন পাথরের ওপর খুরের শব্দ না তোলে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, একা একা থাকার পর ঘোড়ার পাল দেখে ডেকে না ওঠে।

ধীরে সুস্থের ব্যাপার নয়। নৈশ অভিযানে চাই ক্ষিপ্রতা, স্থির সংকল্প। বাখতিগুল টেনে রইল লাগাম, মাথা নোয়াবার অবকাশ দিল না ঘোড়াটাকে। নিজেও সে সতর্ক হয়ে উঠল, যে কোনো আচমকা ঘটনার জন্যে সর্বদাই তৈরি। ছোট ছোট বাঁকা চোখদুটো তার পাখির মতোই গোল আর চওড়া হয়ে উঠল, সত্যিই যেন সে দেখতে পাচ্ছিল অন্ধকারে।

তৃণভূমি বরাবর ধীরে ধীরে ঘোড়ার পালটা উঠছিল ওপরে, বাখতিগুলের দিকে। এখান থেকে শুধু জোরে একটা ঢিল ছোড়ার ফারাক। একলা একটা শিলার তলে থামল বাখতিগুল। ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘর ঘর করে ঘোড়াগুলো রসালো ঘাস ছিঁড়ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে খেলায় মত্ত বাচ্চাগুলোর কচি ডাক।

মর্দাগুলোও ডেকে উঠছে থেকে থেকে, চারণ মাঠের সতর্ক, স্নেহাতুর, জঙ্গী কর্তা তারা। মুহূর্তের জন্যে বাখতিগুল ঘোড়ার পালের ঝিলিমিলি চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেল।

ভয় পেয়ে গেল সে — একি, ভোর হয়ে এল নাকি? না, এখনো সূচিভেদ্য অন্ধকার। কিন্তু পালটা ভালোই, অঢেল ঘোড়া।

বাখতিগুল টুপি খুলে সেটা ঝুলিয়ে দিলে জিনের সঙ্গে। লম্বা মোচটা দাঁতে কামড়ে কান পেতে রইল। না, সন্দেহজনক কিছু নেই। পালের রাখালরা হয় দানোর মতো ধূর্ত, নয় স্রেফ ঘুমচ্ছে। লোকের সাড়া শব্দ কিছুই নেই। তবে ঘোড়াগুলো দল বেঁধে চরছে, এইটে আশঙ্কার কথা। এটা অমন খামোকা নয়। বুদ্ধি করে কেউ তাদের ওইভাবে জুটিয়ে পাল বেঁধে অন্ধকার রাতে নিয়ে যাচ্ছে নতুন ঘাসের সন্ধানে।

হঠাৎ জমাট পালটা থেকে সরু একটা সার বেঁধে একদল ঘোড়া এগিয়ে আসতে লাগল সেই শিলাটার দিকে, যেখানে লুকিয়ে ছিল বাখতিগুল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠের ওপর শুয়ে পড়ল সে, ঘোড়াটার মুখটাও ঠেলে নামালে মাটির দিকে। বিচ্ছিন্ন দলটা খানিক এলোমেলো হয়ে ফের মিশে গেল। ও হো! তার মানে একটা মর্দা তার নিজের দলটাকে জুটিয়ে নিয়ে গেল। তার মানে, পালের পাহারাওয়ালা আশেপাশে নেই...

বাখতিগুল হাঁটু দিয়ে আস্তে গুঁতো দিল সিভিকে, ঘোড়াও অমনি আস্তে আস্তে, যেন চরতে চরতেই এগিয়ে গেল পালের দিকে।

দলটা সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে উঠল, পাশে সরে যেতে লাগল, বাইরের ঘোড়াকে কাছে ঘেঁসতে দিতে তারা রাজী নয়। দীর্ঘ-কেশরী চমৎকার একটি মর্দা ঘোড়াকে ঘিরে দলটা জুটেছিল, মাথা উঁচু করে ঘোড়াটা সংক্ষিপ্ত একটু হ্রেষাধ্বনি করল, ঠিক যেন বা জানতে চাইল কে তুই? ঘোড়ার পিঠে যে মানুষ রয়েছে সেটা অবশ্যই তার নজরে পড়েছিল।

অভিজ্ঞ কানে এই হেঁড়ে ডাকটার মানে বুঝতে দেরি হবার কথা নয়; এটা হুমকির ডাক, যুদ্ধের ডাক। পালের পাহারাওয়ালা জেগে না ওঠে! কিন্তু সিভি ঠিক সময়েই পাশে সরে এসেছিল। বাখতিগুল ভান করল যেন জিনের ওপর বসে বসে সে তন্দ্রায় ঢুলছে। মর্দাটা মাথা নামিয়ে নিলে।

এ দলটার ঘোড়াগুলোকে প্রথমটা মনে হয়েছিল বড়ো ছোটো — একবছর দুইবছরের বাচ্চা। রাত্রে একেবারে কাছে না গিয়ে দাঁড়ালে ঠাহর করা কঠিন কে কতটা পুরুষ্টু। ধীরে ধীরে সিভি কাছিয়ে এল আবার। তারপর লোভে লোভে চোখ কুঁচকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে বাখতিগুল। হ্যাঁ এইটে! পাওয়া গেছে মনের মতোটিকে... বড়ো সড়ো, তেজীয়ান একটা মাদী ঘোড়া, এ দলটার মধ্যে সবচেয়ে সেরা, হয়ত বা গোটা পালের মধ্যেই। চিকন, গোলালো শরীর, ঘাড়ের কেশর ছাঁটা, চরছে মদ্দাটার পাশাপাশি — খাসা ঘোড়া...

জিন থেকে লোমের তৈরি ফাঁস বার করলে বাখতিগুল। এখন আর কোনো দ্বিধা নেই তার। সুশিক্ষিত সিভি গিয়ে দাঁড়াল একেবারে দলটার মাঝখানে, ঘুড়িটার ঘাড় ঘেঁসে, অন্ধকারে হাত ফসকাল না বাখতিগুলের, নিখুঁত লক্ষ্যে ফাঁস

ছুড়লে সে তার গলায়। তেমন লক্ষ্যে উড়ন্ত পাখিকেও বুঝি সে তার ফাঁসে বাঁধতে পারে।

ঘুড়িটা কিন্তু গোঁয়ার — সারা গ্রীষ্মেও তার গলায় লাগাম পড়ে নি। ছটফট করে ভয় পেয়ে সে ছুট দিল তার দল ছেড়ে। কিন্তু তার জন্যে তৈরি ছিল সিভি। এই তো তার প্রথম নয়! হুকুমও দিতে হল না, সিভিও সবেগে ছুটল তার পেছু পেছু, মনিবের হাত থেকে ফাঁসটা খসে যাবার কোনো অবকাশই দিলে না।

তেজী ঘুড়িটা অনেকক্ষণ ধরে গোঁয়ার্তুমি করলে, ফাঁসটায় এমন টান পড়ছিল যে লাফের সঙ্গে সঙ্গে তারের মতো তা বেজে উঠছিল। বাখতিগুলও হিসেবী লোক, আলগোছে ধরে রইল সে, হাত থেকে ফাঁসের দড়ি খসতে দিল না। সিভিকে চালাবার দরকার ছিল না তার, সে ঘোড়া নিজেই যাচ্ছিল যেখানে দরকার, সওয়ারীর প্রতিটি কৌশলে সাহায্য করছিল। ঘোড়াটা অনবরত চাঁট মেরে ছোটাছুটি করে বেড়াল, ফলে হাঁপিয়ে পড়ল শিগগিরই, চক্কর দিয়ে ঘুরতে গেল পালের দিকে। এইবার বাখতিগুল তার রাখালিয়া হাত আর কোমরের জোর দেখালে। জিনের ওপর অস্ফুট শব্দ করে টান টান হয়ে সে প্রায় জিনের ওপর চিত হয়ে পড়ল। ফাঁসের মধ্যে শক্ত হয়ে বাঁধা পড়ল ঘুড়িটা, বেগ কমে এল, তারপর মাথা নুইয়ে একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল।

ফাঁসের দড়ি গুটতে গুটতে সাবধানে এগুল বাখতিগুল, সেই সঙ্গে আদর করে কর্তৃত্বের সুরে আশ্বাসও দিতে লাগল ঘুড়িকে। তারপর কাছে গিয়েই চট করে লাগাম পরিয়ে দিলে

মুখে। বৃষ্টিতে আর ঘামে ভেজা ঘুড়িটার ওপর সপসপ করে হালকা চাবুক কষে নিয়ে চলল সঙ্গে করে।

পালের ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে হুটোপাটি শুরু করে দিলে, ঘেঁসাঘেঁসি করে তারা পালাতে লাগল বাখতিগুলের কাছ থেকে। এটা নজরে না পড়ে পারে না। আর সত্যিই মস্ত এক লাঠি হাতে বড়ো ঘোড়ায় চড়া, ঠিক যেন এক প্রকাণ্ড কবন্ধ মূর্তি দেখা দিল ঠিক তার সামনে, বলা ভালো ঠিক তার মাথার ওপরেই...

মতিভ্রম নয়ত? না... কবন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে, নড়ন চড়ন কিছু নেই। দেখছে, ঠাহর করছে, নিজেদের লোক নাকি বাইরের লোক? মাথায় ওর সত্যিই গোবর...

বাখতিগুল জোর কদমে ছোটাল সিভিকে, ওকে পাঠালে আগে। মূর্তিটা দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে লাগাম চেপে ধরলে ঘোড়াটার। শেষ পর্যন্ত মাথা খেলিয়েছে বটে! ব্যাপার খারাপ। লোমের তৈরি ফাঁসটা কি ভাবে তার কাঁধে চেপে বসবে ভেবে শিউরে উঠল বাখতিগুল... তবে মূর্তিটার হাবভাব কেমন যেন তাজ্জব। সিভিকে সে ধরে রইল কেমন যেন অনিচ্ছায়, আলসেমি করে, আলগোছে। দলের লেঠেলদের ডেকেও তুলল না। কিসের প্রতীক্ষায় যেন চুপ করে রইল, কেবল ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

বাখতিগুল রেকাবের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখে অনিচ্ছাতেই হেসে উঠল। ঠিকই বটে, সামনে তার লড়াকু ভেড়া নয়, গোবেচারা মেষ। লোকটা কোকাই, নামকরা পালোয়ান, গায়ে ঘোড়ার মতো দুর্ধর্ষ জোর, কিন্তু কলজেটা খরগোসের

মতো, সারা তল্লাটের লোক তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। একটা লোকও নেই যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে নি, মজা করে নি।

'হাড় গংঁড়িয়ে দেব... কাগতাড়ুয়া কোথাকার!..' ভয়ঙ্কর চাপা গলায় হিসিয়ে উঠল বাখতিগুল, চাবুক হাঁকিয়ে মাথা থেকে তার টুপিটা খসিয়ে দিলে।

মারটায় ঘা তত ছিল না, যতটা ছিল অপমান। কোকাই কিন্তু ওতেই ধপাস করে উল্টে পড়ল জিন থেকে, আশ্রয় নিলে নিজের ঘোড়ার দেহের আড়ালে, ফোঁস ফোঁস করতে লাগল আরো বেশি করে। এমন কি চেঁচিয়ে সঙ্গীদের ডাক দেবারও সাহস হল না তার। জানত, সবাই হাসাহাসি করবে, চিরকাল যা হয় তাই হবে। তার চেয়ে বরং চুপ করে থাকাই ভালো, রাতের অন্ধকারের গা ঢাকা দিয়ে আল্লার নাম নেওয়া যাক, অচেনা আপদটা যত তাড়াতাড়ি সরে পড়ে ততই মঙ্গল।

বাখতিগুল লাগাম টেনে ঘোড়া ছোটাল পাইন গাছে ভরা বড়ো খাদটার দিকে। এখানে লুকিয়ে থাকার সুবিধা আছে, দিনের বেলাতেও এখানে তার সন্ধান মেলা দায়।

কিন্তু কোকাই হল সালমেনের লেঠেল, খোদ সালমেনের! তার মানে একেবারে ঠিকই ঘাই মারা গেছে, ঠিক একেবারে লোভী শুয়োরে হৃৎপিণ্ডটাতে। খামোকাই সে দুদিন ধরে এত দুশ্চিন্তা করছিল...

সিভি ছুটল পুরাদমে, পালটাকে এড়িয়ে। মাদী ঘোড়াটাও বাধ্যের মতোই, বলতে কি সাগ্রহেই চলল পাশাপাশি, কাঁধে

কাঁধ লাগিয়ে। সামনে শীতল খাদটা হাঁ করে আছে। আর এইখানেই উদয় হল আর একটি লেঠেলের।

খাসা একটা ঘোড়ায় সে ছুটে এল ওপর থেকে, পাহাড়ে পথটা বেয়ে বাখতিগুলের পথ আগলে। চিৎকার করে হাঁক দিলে:

'এই, কে ওখানে? কে রে?'

তার গলার স্বর, তার সুনিশ্চিত হাবভাব থেকে বাখতিগুল মুহূর্তেই চিনল তাকে। লোকটি সোজা নয়, দানোকেও ছেড়ে কথা কইবে না। সালমেনের ওখানে বাখতিগুল নিজেই একদিন ওই পদেই ছিল। বাই জানত কে তার ভরসা।

সিভির ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে বাখতিগুল নীরবে তার লাঠি বাগিয়ে ধরলে। লেঠেলটা পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে গলায় যত জোর আছে চেঁচিয়ে উঠল:

'ওহে!.. এই দিকে! আমার কাছে চলে এসো ভাই সব!..' সে স্বরের গমগমে প্রতিধ্বনিটাও যেন পায়ে পায়েই ছুটে এল তার সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকেই শোনা গেল অন্যান্য লেঠেলদের হাঁক। যে ভাবে একসঙ্গে সবাই সাড়া দিয়ে উঠল তাতে বোঝা গেল কেউ ওরা ঘুময় নি, আর সংখ্যাতেও তারা অনেক। অন্ধকারের মধ্যেও তারা বেশ চটপট নির্ভুল ঠাহর করতে পারছিল কোন দিকে যেতে হবে, কোনোই গোলমাল হচ্ছিল না তাদের। পেছনে ক্ষিপ্ত পশ্চাদ্ধাবনের খুরের শব্দ কানে এল বাখতিগুলের।

বহু কণ্ঠের ক্রুদ্ধ সোরগোল উঠল গোটা পালটা জুড়ে।

লেঠেলরা গালাগাল লাগালে পরস্পরের সঙ্গে... অমনি শুরু হয়ে গেল তুমুল কাণ্ড... মুহূর্তের মধ্যে শান্ত বাধ্য ঘোড়ার পালটা উঠল উন্মাদ হয়ে।

গণ্ডা গণ্ডা মাথা আর ঘাড় উঠল সচকিত হয়ে, ঝাপট মারতে লাগল লম্বা লম্বা লেজ, ছুটতে লাগল ঠিক একেবারে ঝড়ের মতো। দাঁত কড়মড় করতে লাগল ঘোড়াগুলো, চাঁট মারতে লাগল। নিজের নিজের দলকে নিয়ে দিগ্বিদিকে পালাতে গিয়ে গোলমাল পাকিয়ে তুলল মর্দাগুলো। খুরের এলোমেলো শব্দে চাপা পড়ে গেল মানুষের স্বর।

ঘোড়ার পিঠগুলো কণ্টকিত হয়ে ঘুরতে লাগল ঠিক পাথুরে নদীর ঢেউয়ের মতো। তারপর সবকিছুই মিলে গেল এক হয়ে — উত্তেজিত, প্রায় গায়ে গায়ে একাকার দেহের এক সম্মিলিত ঘূর্ণিপাকে। সে ঘূর্ণিপাক হঠাৎ উত্তাল হয়ে উঠল এক ভয়ঙ্কর মারাত্মক তরঙ্গে, হাজার হাজার খুরের দাপাদাপিতে পিষে যেতে লাগল সবকিছু।

যেন বা বন্যা নেমেছে, আগুন লেগেছে, এমনি একটা উন্মাদ আতঙ্কে গোটা পাল দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে চলল জাইলিয়াউয়ের ঘাস বরাবর। ক্ষিপ্তের মতো গায়ে গা লাগিয়ে জমাট একটা পিণ্ডের মতো ধাবিত হল তারা, খুরের চাপে ছিটকে পড়ল কমজোরীরা, বরফের হিমবাহের মুখে হালকা পাথরের মতো একবছরেরা, বাচ্চারা উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে লাগল মরণের কোলে।

মনে হল যেন কানে তালা ধরানো একটা অবিরাম বজ্রপাত ভেঙে পড়েছে পাহাড়ে মাঠটার ওপর, চারিপাশের পাহাড়ের

পিঠটার ওপর, খাদটা থেকে শুরু করে গিরিদ্বার পর্যন্ত গোটা এলাকাটায়। ভাগ্যি ভালো ঘোড়ার তাণ্ডব খাড়াই পাড়টার দিকে ধেয়ে যায় নি।

রাখালরা একের পর এক ছোটা থামিয়ে ফিরল উল্টো দিকে। টনকটা ওদের নড়ল খুব দেরিতেই। কেউ জানত না কে কার পেছনে তাড়া করছে। অন্ধকারে সবই তো গুলিয়ে যাবেই।

ঘোড়ার পালকে থামিয়ে শান্ত করতে বেগ পেতে হল কম নয়।

তবে শেষ পর্যন্ত শান্তি ফিরল, ঘোড়ার মাথাগুলো ফের নেমে এল ঘাসের দিকে। শুধু বাচ্চা-হারা মাদী ঘোড়াগুলোর মর্মভেদী ডাক শোনা যাচ্ছিল স্তব্ধতার মধ্যে।

কলরব করে তর্ক জুড়ল রাখালরা, পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগল তারা:

'ব্যাপারটা হল কি? কে প্রথম হাঁক দিলে? কোত্থেকেই বা এল ঐ হতভাগা শয়তানটা? কে তাকে চাক্ষুষ দেখেছে?'

দেখা গেল ঠিক পরিষ্কার করে কেউ কিছুই জানে না, কেউ কিছুই দেখে নি। তবে রাতের বেলা, হাঁক না দিয়ে উপায় কী? কথায় বলে, আঁধিয়ারায় চোখ চলে না, হাঁক চলে ...

হাঁকদাররা চারিদিক দেখে শুনে আবিষ্কার করল হেড লেঠেলকে দেখা যাচ্ছে না।

ফিরল সবাই খাদটার দিকে, চাপা গলায় ডাকাডাকি করলে জামান্তাইকে।

চটপটে কোকাই তাকে খংজে বার করলে মাঠটাকে বেড় দেওয়া পাথুরে ঢালুর খোঁচা খোঁচা শিলাগুলোর মাঝখানে। নির্জীব গলায় কোঁকাচ্ছিল জামান্তাই, রক্তের গন্ধ আসছিল। কাছেই তার পড়ে আছে লাঠিটা, কিন্তু আশেপাশে তার ঘোড়াটার কোনো চিহ্নই নেই।

'এই!..' চেঁচিয়ে উঠল কোকাই, 'দ্যাখ, দ্যাখ, কে ওর চাঁদি ফাটিয়ে দিয়ে গেছে... গায়ে আর রক্ত নেই!'

জামান্তাইকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল।

'বেঁচে আছে। নিঃশ্বাস পড়ছে... কে করলে? কে?'

হেড লেঠেল অস্ফুট স্বরে গোঙিয়ে উঠল, আঙুল দেখালে খাদটার দিকে।

এই পাথরগুলোর কাছেই তার সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগে বাখতিগুলের। জামান্তাই প্রথম বাড়িটা মারে, কিন্তু মারে উত্তেজিত অবস্থায় ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতেই, তাই বাড়িটা তেমন জবর হয় নি, লাঠির মাঝখানটা পড়ে বাখতিগুলের ঘাড়ে। কিন্তু জবাবে যে বাড়িটা সে নিজে খায় সেটা মোক্ষম — সওয়ারী ঘোড়া দুজনেই উল্টে পড়ে।

লোকটাকে চিনে ওঠার সুযোগ হয় নি জামান্তাইয়ের। কিন্তু রাতের বেলায় একলা সবটা সামলানো, অতগুলো পাহারাকে বোকা বানানো, এ দেখে বোঝা যায় চোরটি ঘোরেল, দুষ্কর্মে তার হাত পাকা। কথায় বলে: ছোটন দেখেই ঘোড়ার দাম, ছোটন দেখেই বাঘের নাম...

খাদটা দিয়ে বাখতিগুল যাচ্ছিল তেমন তাড়াহুড়া না করে। প্রথমটা ও কান পেতে শুনলে, তারপর নিশ্চিন্ত হল।

সিভিও কান খাড়া করছিল না। পেছনে তার কেউ তাড়া করে আসছে না। তাহলেও সাবধানের মার নেই, গাছপালাগুলোর মাঝখানে কয়েকবার ঘুরলে সে, শেয়ালে চক্কর দিলে কয়েকটা। ভেজা মাটিতে খুরের দাগ ফেললে, ফিরে এল পাথরের ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে। তবে বৃষ্টির পর ওর ঘোড়ার দাগ কি আর থাকবে।

চলল বাখতিগুল, নিয়ে চলল তার লুট। থেকে থেকেই সে চেয়ে দেখছিল মাদী ঘোড়াটার দিকে, মুগ্ধ হয়ে চাইছিল। ভারি পছন্দ হয়েছে তার ঘোড়াটা।

ঘাড়টায় চাপড়াল সে, ছোটো ছোটো কেশরের তলে টান টান চর্বির স্তরটা অনুভব করা যায় বেশ। আঙুল বসালে স্প্রিঙের মতো ধাক্কা মারে। যেমন তেমন জিনিস নয়। অনেক দিন এমন খুশি বোধ করে নি বাখতিগুল।

'খাসা ...' আহ্লাদে হাঁপ ছাড়লে সে, 'সুন্দর ঘোড়া!..'

তারপর পাছে কুদৃষ্টি পড়ে এই ভয়ে থুতু দিলে আঙুলে, 'থুঃ থুঃ!'

না থেমে ঝিরঝিরিয়ে হয়েই চলেছে বৃষ্টি। বাখতিগুলের মুখ ধুয়ে যাচ্ছে জলে। হেসে নিজের ভেজা মোচটায় পাক দিল সে। পথ হারাবার ভয় তার নেই। কালিঢালা আকাশ, কালো পাহাড়, সিভির মুখের সামনে ঠিক ভেড়ার লোমের মতোই অন্ধকারের কুণ্ডলী — কিন্তু এ অন্ধকারেও বাখতিগুল দেখতে পাচ্ছিল আকাশ, দেখতে পাচ্ছিল পাহাড়, পরিষ্কার চোখে পড়ছিল তার পথ।

ভোরের অনেক আগেই ঝাঁঝালো গন্ধে সে টের পেল যে সারিমসাক্তি বনে ঢুকেছে। এবার আর চড়াই নয় উৎরাই — উঠতে কঠিন, নামতে সোজা... আর সিভিও কাজের ঘোড়া! কিন্তু বনের ফাঁকাটায় ঝাঁঝালো গেছো গন্ধ নাকে আসতেই চোখ মুখ কুঁচকে উঠল তার, ফিরল বাখতিগুল, গা ঘুলিয়ে উঠল কেমন। মশকে যেটুকু ঘোল বাকি ছিল সবটা সে নিঃশেষ করে নামল ঘোড়া থেকে। জিনটা খুলে নিয়ে সিভির বুক পিঠ গা দলাই মলাই করে দিলে খানিক। সিভিরও খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া দরকার, শুকিয়ে নেওয়া দরকার — খিদেয় সম্ভবত ওরও পেটের নাড়িভুঁড়ি কামড়াচ্ছে।

বুড়ো একটা পাইন গাছের তলে জিনটা পেতে বসে ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল বাখতিগুল। সিভি তার মুখটা দিয়ে আস্তে আস্তে গুঁতো দিলে মনিবের কাঁধে। সত্যিই, উঠতে হয়। ভোর হবার আগেই আরো দূরে সরে যেতে হবে। লুটের মাল যখন লাগামে বাঁধা, তখন গড়িমসি করা চলে না।

ফের সিভির ওপর জিন চাপালে বাখতিগুল, পেছনের দিকে শক্ত করে বাঁধলে দড়িটা। জিনটা তাহলে গড়িয়ে আসবে না ঘোড়ার ঘাড়ের দিকে, কেননা এবার পথটা কেবলি নিচে, কেবলি নিচের দিকে।

৩

সকালের দিকে বৃষ্টি থামল, গরম হয়ে উঠল আবহাওয়া। ঘুম পেয়ে গিয়েছিল বাখতিগুলের। জিনের ওপর বসে বসেই সে ঢুলছিল, মোচটা গিয়ে ঠেকছিল বুকে।

সজাগ হয়ে উঠল নাক ডাকতে। ভয়ে চমকে উঠল সে। স্বপ্ন দেখছিল কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে।

আলো ফুটে উঠল। এবার কারো চোখে না পড়লেই বাঁচি...

বাখতিগুল যাচ্ছিল গোপন ঘুর পথ দিয়ে, কারাচাই ঝোপের ভেতর দিয়ে পথ করে, ঘোড়ার আঁটুলির মতো সে ঝোপ ছেঁকে ধরে, মাকড়সার জালের মতো সে ঝোপ জড়ানো।

দিনের আলোতেও এবার ও লুকিয়ে রইল না, কেবলি ঘোড়া ছোটাল। দম নেবার জন্যে নিজেও থামলে না, ঘোড়াকেও থামাল না।

সিভির কানে কানে সে বললে, 'এবার বাড়ি... ছেলেমেয়েরা পথ চেয়ে আছে...'

বাখতিগুলের শীতের ডেরাটা ফাঁকা পাহাড়ের একটা নিচু কোলে অনাথের মতো ঠাঁই পেতেছে। ধুলো ওড়ানো ক্যারাভানের পথ এদিক দিয়ে যায় নি, তাই তাড়িয়ে আনা দলকে দল ঘোড়াকে এখানে লুকিয়ে রাখা যায়। বাখতিগুলের জন্ম এখানে, মা-বাপকে কবর দিয়েছে এইখানেই। এখানে ও নিজের মতো।

দূর থেকে শীতের ভিটেটা দেখা দিতেই সে নামলে, মাদী ঘোড়াটার সামনের পাদুটোয় দড়ি বাঁধল, নিজের পা টান করতে করতে চলল সে, শুকনো ঠোঁটদুটো চেটে নিলে একবার।

বরফ পড়তে এখনো মাস খানেক বাকি, ওরা তাই এখনো থাকে তাঁবু পেতে, মোটা কাপড়ের ছেঁড়াখোঁড়া তাঁবু, ঘোড়ার ঘেরটার কাছেই।

বাখতিগনুল হাঁক দিল, ক্লান্ত হাসিটা চাপার জন্যে হাত বোলালে মোচে। হাতশাকে দেখতে পেল সে। রোদে পন্ড়ে দেহের রং তার প্রায় কালো, জীর্ণ ন্যাতাকানিতে কোনো রকমে গা ঢেকেছে, উনন্ন নিয়ে সে ব্যস্ত, চা ফোটাচ্ছে ছেলেমেয়েদের জন্যে। ছেলেমেয়ে তাদের তিনটি, প্রথম ছেলে সৈয়দের দশ বছর বয়স, দ্বিতীয় জন্মাবাইয়ের পাঁচ বছর আর দন্ বছরের কালোচুলো ছটফটে বাতিমা এখনও মায়ের দন্ধ খায়। দন্টি ছেলে একটি মেয়ে... বাখতিগনুল আর হাতশার এই শন্ধন্ বন্কের ধন।

বাপ ফিরেছে, হৈচৈ হন্টোপাটি কিছন্ই না, কিন্তু কালো ইয়ন্র্তা যেন আলো হয়ে উঠল। হাতশা দীর্ঘাঙ্গী, আঁটসাঁট গড়ন, আনন্দে আশঙ্কায় সে আড়ষ্ট হয়ে গেল স্বামীকে দেখে। বাখতিগনুল কাছিয়ে এল ধীরে ধীরে, একটি কথা কইলে না, পন্রন্ষের মান খোয়ালে না। দরজার কাছে পাতা খড়গন্লো মাড়িয়ে ঢুকলে ভেতরে, একটু কন্থিয়ে বসলে দরজার ঠিক উল্টোদিকে দেয়াল ঘেঁসে বাড়ির কর্তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। এ আসনের নাম 'তোর', ইয়ন্র্তার মধ্যে সবচেয়ে সম্মানের জায়গা। দীর্ঘ কঠিন যাত্রার শেষে নিজের চালার নিচে কি মিষ্টিই না এখানে বসতে।

তবে মোচ পাকাতে পাকাতে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা হল না। আর পেরে উঠল না সে, চুল্লির লাল কয়লাগন্লোর দিকে নাক এগিয়ে দিল।

'তা বউ, বল শন্নি... উনন্নে আঁচ জন্বলে কি, চটপট হাত চলে কি? দাঁতে কাটার মতো আছে কিছন্ ঘরে...'

হাতশার ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চওড়া কাঁধের ওপর। কিন্তু সাহস পেল না। ভয়ে ভয়ে সম্ভ্রম করে সে দূর থেকেই শুধাল:

'যাত্রায় ফল হল কিছু?'

'গতর নড়া বাপু...' জবাব দিলে সে খেঁকিয়ে, 'বকবক করার সময় নেই অত।'

ঘরে যা ছিল সব হাতশা বিছিয়ে দিলে। শুকনো ভেড়ার নাড়ির স্বচ্ছ নলীতে বসন্তকাল থেকে সে যে ঘিটুকু জমিয়ে রেখেছিল, সেটাতে কার্পণ্য করল না। খাবারের সিন্দুকটার একেবারে তল থেকে সেটা টেনে বার করল; এগিয়ে দিলে স্বামীর দিকে। গরম চা ঢাললে। তবে সেই সঙ্গেই আলগোছে তার কনুই কাঁধটা ছুঁয়ে নিল খানিকটা। শব্দ করে গরম চায়ে চুমুক দিল বার্খাতিগুল, হাতশার বুকের ভেতরটা যেন ভরে উঠল। সেটা চোখে পড়ল বার্খাতিগুলের।

ঘরে আজ উৎসব। চোখ জ্বলজ্বল করছে ছেলেমেয়েদের, গা থেকে যেন আনন্দ চুইয়ে পড়ছে। জুমাবাই আর বাতিমা চুপি চুপি ঠোকাঠুকি লাগাল দুজনে, হাসাহাসি করতে লাগল দুষ্টুমি করে। সৈয়দ কড়া করে শাসালে ওদের, কিন্তু নিজের মুখেই তার একগাল হাসি।

বার্খাতিগুলের মনের ভেতরটাও আজ হাসিতে ভরা। বহুদিন থেকে তার বুকের ওপর যে ভারটা চেপে বসেছিল সেটা আজ এই প্রথম যেন নেমে গেল। কিন্তু মুখ দেখে তার খুশিটা বোঝা যাবে না। আর খামোকা কথা খসাতেও তার গরজ নেই। বসে বসে চা খেলে, হাত বোলালে মোচে।

চা গিললে পর পর তিন পেয়ালা, তারপর মোচ মুছে উঠে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে। দরজার কাছে মুখ ফিরিয়ে নেহাৎ যেন কথার কথা হিসাবে বৌকে বললে:

'একটা বস্তা নিয়ে আয়।'

দুরুদুরু বুকে ঠিক এই কথাটির আশাতেই ছিল হাতশা। চটপট করে ইয়ুর্তাটায় ঢুকে সে বড়ো ছেলে সৈয়দকে বললে:

'ঘর থেকে যাস না কোথাও। আগুনটা দেখিস, কেউ যদি আসে, খোঁজ করে, বলিস মা গেছে ঘুঁটে কুড়তে, শিগগিরই ফিরবে।'

ইয়ুর্তায় রইল কেবল ছেলেমেয়েরা। শুরু হয়ে গেল হৈচৈ। ছেঁড়াখোঁড়া ফেল্টের দেয়ালের ভেতর থেকে কখনো উঠছে চিৎকার কান্না, কখনো বা খিল খিল হাসি। জুমাবাই জ্বালাতন করতে পারে বটে, ভাই বোনের হাত থেকে দুধের সরের শুকনো টুকরো নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি লাগাল সে।

স্বামীর দেখা হাতশা পেলে অদূরেই, ছোট্ট শুকনো একটা তুহিন ডোবার মাঝখানে। তলটা তার পাথুরে, ফাটলগুলোয় নিরেট হয়ে জমে আছে গত বছরের তুষার, পিছল তীরটা ঠিক যেন ভেড়ার খুলিতে বাঁধাই, শিঙের মতো খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে দুধে-আলতা পাথর, লম্বা লম্বা ঘাস ঝুলছে ঝুপড়ি বেঁধে — ঠিক যেন ছাগলের দাড়ি। জায়গাটা চোখে পড়ে না বিশেষ। ছুটে আসতে গেলে ঘোড়ার ঠ্যাং ভাঙবে, আর সওয়ারীর ভাঙবে ঘাড়।

ছড়িয়ে পড়ে আছে ঘুড়িটার লাশ, তার পাশে উঁচু হয়ে বসেছে বাখতিগুল। শুরু করে দিয়েছে ছাল ছাড়াতে। ছায়ায়

ঢাকা পাথুরে গর্তটা ঠাণ্ডা। ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে মাংসের। চটপট নিপুণ হাতে স্বামীর সাহায্যে এগুল হাতশা।

চামড়ার ওপর বাখতিগুল উজাড় করে ঢেলে দিলে ঘোড়ার পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো, তা নিয়ে কম ধকল গেল না হাতশার। এগুলো বাছা মেয়েদের কাজ, হাতশা সাধ্যমতো সে কাজ করে গেল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকেই হাতশা চ্যাপটা পাথরের ওপর নিপুণ হাতে আগুন জ্বালিয়ে তুললে। স্বামী তার কতদিন যে মাংস খায় নি, খোদা জানেন। জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে সে পুরুষ্টু মেটে আর গোটা দুই-তিন ভালোমতো টুকরো গুঁজে দিলে — সংসারের রোজগেরে লোকটাকে ভালোমতো দুমুঠো দিতে হয় বৈকি।

চঞ্চল হয়ে আগুনের দিকে তাকাল বাখতিগুল। ধোঁয়া দেখে আবার অনাহূত অতিথি কেউ না জোটে... কিন্তু কিছুই বললে না সে। খিদেয় বুদ্ধি আসে ঝাপসা হয়ে। এ আগুনটাকে বাঁচিয়ো আল্লা, এই খাওয়াটা খেতে দিও!..

মেহনত চলল সন্ধে পর্যন্ত, হাত গুটিয়ে বসার সময় ছিল না। লাশটাকে ভাগ ভাগ করা হল, চামড়া ঢাকা মাংসের ওপর পাথর চাপা দিয়ে ভালো করেই লুকিয়ে রাখা হল সবকিছু। আলাদা করে রাখা হল শুধু সপ্তাহ খানেকের মতো মাংস আর নাড়িভুঁড়ি। পরিমাণটা অল্পই, কিন্তু ক্ষেতমজুরের সংসারে ওতেই ভরপেট চলবে। অন্ধকার হতে ছাউনিতে ফিরল ওরা।

উনুনের সামনে হাতশার রকম-সকম দেখে শেষ পর্যন্ত বাখতিগুল মোচের ফাঁকে না হেসে পারল না। জলভরা ফুটন্ত

লোহার কড়াই ঝোলালে আগুনের ওপর, তার মধ্যে একটুকরো নরম মাংস আর হৃৎপিণ্ডটা ছেড়ে দিলে সে, তারপর সেদ্ধ জিনিসটা ভালো করে চর্বির মধ্যে সাঁৎলালে। সেই সঙ্গেই জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর মেটেটা পুড়িয়ে নিলে সে, ভাগ করে দিলে ছেলেমেয়েদের।

রাতটা ছিল ঠাণ্ডা কনকনে, কিন্তু ইয়ুর্তার ভেতর গরম, পরিপাটি ঘরোয়া পরিবেশ। সৈয়দ কাঠ বয়ে দিচ্ছিল মায়ের হাতের কাছে। খুবই খাটছিল ছেলেটা, কিন্তু বাখতিগুলের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। ছেলেকে ডাকলে সে। অনিচ্ছা ভরেই যেন এসে দাঁড়াল ছেলে, হঠাৎ কেমন ভার হয়ে উঠেছে তার মুখখানা।

আগেও এরকম হয়েছে তার। কেমন যেন অদ্ভুত হয়েছে ছেলেটা, বয়স ছাড়িয়ে তার ভাবনা, সীমা ছাড়িয়ে প্রশ্ন, খাপছাড়া মেজাজ। ঘরে সবার মন ভার, থমথমে চুপচাপ — ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে বড়োদের মধ্যে। ওর কিন্তু গ্রাহ্যি নেই, ধেই ধেই নৃত্য শুরু করে দেয়, লাফায় ঝাঁপায় ঠিক ছাগলছানাটির মতো। আবার সবাই বেশ হাসিখুশি, ও ওদিকে নাক গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে। তোলে কার সাধ্যি। তেমন মেজাজ হলে কিছুতেই কিছু না। তাকায় যেন মার খাওয়া কুকুর, ক্ষেপে গেছে যেন, মুখ ভার করে উদাস হয়ে তাকায় — চোখ কান কিছুই যেন নেই — মা-বাপের ডাকেও তখন মুখ ফেরায় না।

এখনো যেন কী এক ভাবনা ঢুকেছে তার মনে, বড়োদের মতোই দুচোখে তার ভারাক্রান্ত দৃষ্টি, ঠোঁটে তার মোচ উঠতে

অনেক দেরি — তবু সেই ঠোঁটেই একটা ম্লান দোষী-দোষী হাসি ...

বার্খতিগুল তাকে বসালে নিজের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গেই জুমাবাই আর বাতিমাও ছুটে এল বাপের কাছে, মাই-টানা কুকুরছানার মতো গায়ের সঙ্গে এঁটে বসল। আগুনটা কাছে নয়, চারজনকেই ভেড়ার চামড়ায় ঢাকা দিলে হাতশা — ছেলেমেয়েরা শান্ত হয়ে এল। মধুর একটা কল্যাণী শান্তি ঝরে পড়ছে যেন। কড়াইয়ে ঝোল ফোটার শব্দ, ইয়ুর্তায় স্বাদু গন্ধ, রসিয়ে রসিয়ে কথা কইছে হাতশা, সংসারের কাজ করছে, সে কথাগুলো বার্খতিগুলের কানে এসে পেঁাছচ্ছে যেন তুলোর বালাপোশ ভেদ করে। বসে বসেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, খেয়াল ছিল না।

গাড়ুতে গরম জল ভরে হাতশা ডাক দিল স্বামীকে, হাত ধুয়ে নিতে বললে। চেষ্টা করে চোখ মেলল সে। দৃষ্টি তার ঘোলাটে, আগুনের ধোঁয়াটে শিখার আলোয় মন হল রক্তে ভরা। ঘুমের মধ্যে পিঠে পায়ে খিল ধরেছিল, পা টান করল সে, গা ঝাড়া দিল, ঘুমের ঘোরে গায়ের ওপর আসা ছেলেমেয়েগুলো ছিটকে পড়ল।

'উহু — হু —, জান গেল ...' বিড়বিড় করলে সে, হাতের চেটোটাকে গোল করে তুললে অঞ্জলির মতো।

'এক্ষুণি গো, এই হয়ে এল ...' সোহাগ করে বললে হাতশা।

তেপায়াটা থেকে মাংসের কড়াইটা নামিয়ে হাতশা মাংস ঢালার জন্যে একটা কাঠের হাতা নিলে। মাটি থেকে উঠে বসল বার্খতিগুল, কালো বাঁটওয়ালা একটা লম্বা সরু ছুরি বার

করলে খাপ থেকে, হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে তার ধারটা পরখ করে নিল। চমৎকার ছুরি, মাংস কাটে ঠিক মাখনের মতো। কেটলি থেকে গরম জল ঢেলে ছুরি ধুয়ে নিলে বাখতিগুল।

'এক্ষুণি গো, এই হল...' বিড়বিড় করছিল হাতশা, আর ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ভেসে এল কুকুরের ডাক।

বুড়ো কুত্তী আর তার বাচ্চাদুটো চেঁচাচ্ছিল সমস্বরে। ডাক শুনে বাখতিগুল বুঝল কুকুরগুলো ছুটছে ঘোড়ার ঘেরটার দিকে।

হাতশা হাতাটা তুলেছিল কড়াইয়ের ওপর, ওই অবস্থাতেই স্বামীর দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে।

হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠল বহু ঘোড়ার খুরের শব্দ, কুকুরের ডাক ডুবে গেল তাতে। পাথরের ওপর ঠকঠকিয়ে ওঠা একটা পরিচিত শব্দ পরিষ্কার ঠাহর করতে পারল বাখতিগুল — 'সইল'এর শব্দ এটা — স্তেপের রাখালদের সেরা হাতিয়ার এই বল্লম।

'লুকিয়ে ফেল মাংসটা... বিপদ ঘনিয়েছে!' ভাঙা ভাঙা গলায় হেঁকে উঠল সে।

ঝড়ের মুখে পালকের মতো পাক খেতে লাগল হাতশা। কড়াইয়ের ঢাকনিটা সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না। খুরের শব্দ কাছিয়ে এল। স্বামীর চোখে রাগ আর বিরক্তি, কিন্তু হাতশা একেবারে বেসামাল। হাতাটা নাড়াতে লাগল সে, ভয়ে ঘেমে উঠে সে কেবল অর্থহীন একটা উক্তি করে চলল:

'এই যে, এই এক্ষুণি...'

দাঁতে দাঁত চেপে গালাগালি দিয়ে উঠল বাখতিগুল। হঠাৎ কিছু না পেয়ে মেঝে থেকে সতরঞ্চি তুলে তাই দিয়ে হাতশা ঢাকা দিলে কড়াইটা, হাতাটা ছুঁড়ে ফেললে জল ভর্তি বালতির মধ্যে, অজান্তেই খিঁচিয়ে উঠল তার হাত, যেন ছ্যাঁকা খেয়েছে কিসে। সতরঞ্চির তল থেকে সুতোর মতো ভাপ উঠছিল, কিন্তু হাতশার সেটা লক্ষ্যে পড়ল না। পাদুটো তার আর বাগ মানল না, ন্যাড়া মাটির ওপরেই ধপ করে বসে পড়ল সে।

ইয়ুর্তায় ততক্ষণে বিনা জিজ্ঞাসাবাদে বিনা সেলামেই ঢুকে পড়েছে লোকে, মুখ তাদের ভয়ংকর। কজিবাকদের লোক এরা, ষণ্ডামর্ক খুনে ডাকাত সব, রাতের হামলাদার লুঠেরার দল। উদ্ধত তাদের আচরণ, বেসরম তাদের চাউনি। দেখেই বোঝা যায় যুক্তি তর্কের পরোয়া করে না, ঘুষি ডাণ্ডাই এদের অভ্যেস।

বুটে চাবুক হাঁকিয়ে গম্ভীর চালে থপ থপ করে ভেতরে ঢুকল মুটকোপেট মুটকোপাছা সালমেন, কোমরে চামড়ার চওড়া কোমরবন্ধ, তাতে রুপোর কাজ করা। তার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল আরো কিছু হোমরা-চোমরা পেট মোটার দল। বুক ফুলিয়ে তারা দাঁড়াল বাখতিগুলের সামনে।

ইয়ুর্তায় এমনিতেই ঘেঁসাঘেঁসি, তাতে আবার পেছন থেকে সবাই ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসতে চাইল বাইয়ের কাছাকাছি। খোঁচা খোঁচা চোখ আর বাদামী দাড়িওয়ালা একটা ক্ষুদে লোক তড়বড়িয়ে পথ করে নিল ভিড়ের মধ্যেই। বাখতিগুলের দিকে সে তাকিয়েও দেখল না, সশব্দে নাক এগিয়ে সে সিধে গিয়ে আসন পাতলে উনুনের পারে, হেলান

দিলে ভয়ে বিহ্বল হাতশার গায়ে। হাতশা সরে এল, লোকটা চোখ মটকে বেহায়ার মতো হাসল। বেহায়া আর ভাঁড়, সমানই নচ্ছার!

লালমুখো ষণ্ডামর্ক এক সওয়ারী চোখ পাকিয়ে নাক ফুলিয়ে মুখ বেঁকিয়ে কামানো ঠোঁটটা চেটে নিয়ে সোজাসুজি শুরু করলে:

'এ্যই, কাল রাতে তুই 'দেন' মাঠে আমাদের পাল থেকে বকনা ঘোড়াকে ভাগিয়ে এনেছিস, পালের লেঠেল জামান্তাইয়ের মাথা ফাটিয়েছিস। এ আর কারো কম্ম নয়। যে জানে সেই বলবে, তোর হাতের কাজ। তাছাড়া সকাল বেলায় পাহাড়ে দেখা গেছে এক সওয়ারী আর দুই ঘোড়া। সন্ধ্যার দিকে তোর ইয়ুর্তার কাছাকাছি ধোঁয়া উঠতেও দেখেছে একজন। মোট কথা, সবই জলের মতো স্পষ্ট। মার-খাওয়া জিগিত* বাপকেও ছাড়ে না! আমাদের তো কথাই নেই। জবাব দে!'

ডাকু গুণ্ডাদের এই গোটা দলটা দেখেও বাখতিগুল ভয় পেল না, যদিও জানত যারা এসেছে তাদের হৃদয় নির্মম, নিরেট, কোনো করুণার আশা নেই এদের কাছে। নিজের মনে মনে সে কসম খেয়ে বললে, 'ন্যায় আমারই, অন্যায় তোমাদেরই! যাই আমি করি না কেন, সালমেন তার প্রাপ্যই পেয়েছে!' তাই সওয়ারীর কথার জবাব না দিয়ে সে বাইকে জিজ্ঞেস করলে:

'আমায় চোর বানাতে চাও দেখছি? বাখতিগুল চোর ছিল কবে?'

---

* জিগিত — কাজাখ সওয়ারী। — সম্পাঃ

সালমেন দাঁত চেপে বললে:

'রাখ ও-সব, দাঁড়কাক ধবল হয় না!'

বাখতিগুলের পাথরের মতো মুখে একটি পেশীও কাঁপল না:

'বাজের সঙ্গে দাঁড়কাক! তোমার সঙ্গে আমার তুলনা? আমার সঙ্গে তোমার শোধবোধ?'

রাগে দম হারাল সালমেন, সারা মুখ হয়ে উঠল টকটকে লাল।

'বটে!.. বটে!.. সাপ কোথাকার!..'

'আগে প্রমাণ দাও! কে আমায় দেখেছে? কে তার সাক্ষী?'

'ভাবনা নেই... সাক্ষী আছে...'

'কোথায় সে? বলুক দেখি মুখের ওপর।'

'চালাকি করিস না!' বাধা দিল বাই, 'ঘোড়া হাঁকিয়ে আনলি, খেপিয়ে তুললি গোটা পালকে... একটা রাতেই এমন লোকসান! এ তুই! তোর কীর্তি, আমার হাতে মানুষ হয়ে এই তোর কাজ?'

'কার হাতে মানুষ তা দেখছি। খুশি হলেই খামোকা লাথি ঝাঁটা। সেই তো তোমার অভ্যেস! আমার ওপর এমন হামলা কেন বলো তো?'

'তুই যে আমার মন্দ খুঁজিস, তুই যে আমায় গাল পাড়িস?'

'খামোকাই কি গাল দিই?'

বাখতিগুলের দিকে ভোঁতা চোখে চেয়ে রইল বাই।

'তোর আমি কি নিয়েছি?'

'বলো, নাও নি কি? গতর থেকে জানটা পর্যন্ত ছিঁড়ে

নিয়েছ। মায়ের পেটের ভাইকে মেরেছ। খুন করেছ লাঠি পিটে...'

'বটে! তার মানে আমি তোর খুনী-দুষমন?'

বাখতিগুল বুকে হাত ছোঁয়ালে।

'আল্লাই তোমায় বলালে... কথাটা তুমিই বললে প্রথম!'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোর? বুদ্ধু বনেছিস?'

সখেদে মাথা ঝাঁকালে বাখতিগুল।

'ভাইটাকে শান্তিতেও মরতে দাও নি... কুশল নেই, দান নেই। ছমাস ধরে কেসে মরেছে, একটা মরকুটে ভেড়াও তাকে দাও নি। মরার আগে জানটাকে তার একটু শান্তিও যদি দিতে...'

জ্বলন্ত চোখ কুঁচকে চুমকুড়ি কাটলে বাই।

'হুঁ হুঁ! এই ব্যাপার... হিসেব মেটাতে হবে! আমার কাছে কত তোর পাওনা? দৌলতের অর্ধেকটাই বুঝি? যত চাই, তাই না! কজিবাকদের, সালমেনের কাছ থেকে আর কি চাস তুই?'

হুমকি দেওয়া কদর্য একটা হাসি শোনা গেল ভিড়ের মধ্যে, কিন্তু বাখতিগুলের ভুরুটাও কাঁপল না। হোক সে একা। ন্যায় তার পক্ষেই!

'হিসাবের কথা বলছ? বেশ। কুড়িটা শীত আমি তুষারে সয়েছি, বরফে শুয়েছি, আর গ্রীষ্মে দিনের পর দিন চোখ বুঁজি নি। কুড়িটি বসন্তে আমার আনন্দ জোটে নি, কুড়িটি শরতে মুখ বুঁজে তোমার ঘোড়ার পাল চরিয়েছি! বেচারী তেকতিগুলও এই একই কষ্ট সয়ে গেছে। আর আজ বার বছর, যে দিন থেকে হাতশা আমার বৌ, সেদিন থেকেই সে হয়েছে তোমার মায়ের বাঁদি। মা তোমার যক্ষ্মায় মরেছে, আমার

বৌয়ের রূপ যৌবনও গেছে সেই সঙ্গে। আর এ সবকিছুর জন্যে কি পেলাম আমরা? খিদেয় না মরা পর্যন্ত বসে বসে আঙুল চোষা!'

'বটে বটে, হতচ্ছাড়া গোলাম কোথাকার!' থুতু ছিটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সালমেন। 'বেশ চিনেছি তোকে। কি আস্পর্ধা! নিজেই চোর চোট্টা আর আমার নামে কালি ঢালতে চাস? দেখাব মজা ... কোথায় বকনা ঘোড়াটা?'

'ঘোড়া চাইতে হলে আদালতে যেও!'

'বটে! হারামজাদা, হতচ্ছাড়া, কাঙাল ... এত তেজ তোর কিসের ভরসায়?'

'তোমার ভরসা বলে, আমার ভরসা ন্যায়ে। বিচার হোক।'

'বিচার! বটে বটে! মুখের যে বাঁধন নেই দেখছি! কজিবাকদের সঙ্গে লাগতে এসেছিস? বিচার চাই তোর, ন্যায় চাই? বেশ ... অত বারফট্টাই যখন তখন আদালতেই যাস। উচিত শিক্ষাই হবে তোর! ঘোড়া ফেরৎ দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গেই। দেখা যাবে কে কাকে সোপর্দ করে ... শেষ বারের মতো জিগগেস করছি — কোথায় ঘোড়াটা? জবাব দে!' রেগে লাল হয়ে চাবুক হাঁকাল সালমেন।

বাখতিগুল নড়ল না একটু, যেন গায়েই লাগে নি। কটাক্ষে সে দেখে নিল লাঠি বাগিয়ে কি ভাবে তার দিকে এগিয়ে আসছে বাইয়ের লেঠেলরা। শুধু একটু ইশারার অপেক্ষা।

নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে:

'তোমার ঘোড়া আমার ঘরে নেই ...'

'কোথায় তবে?'

'একজন দোস্তকে দিয়েছি, হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে আরো দূরে। বিশ্বাসী দোস্ত, ঠকাবে না...'

'মিথ্যে কথা, পিটিয়ে ঢিট করব তোকে।'

'মিথ্যে যদি তো জিগগেস করতে এসেছ কেন! জবাব দেব না।'

এই সময় উনুনের পারে যে লাল দাড়িওয়ালা বেঁটে লোকটা শুয়ে ছিল, সে একটু গা তুলে ঘড়ঘড়ে রগুড়ে গলায় বলে উঠল:

'ইস্ — জবাব দেবে না! কবুল না করে যাবি কোথায়? খামোকা এমনি কেউ ঘোড়া চুরি করে না। রগড় বটে! বলি শোনো, ওই যে কড়াইটিতে গিন্নির চোখ আটকে আছে, হাঁ ঠিক উইটিতেই আছে। আহ নাক সুড়সুড় করছে ... ওহে সওয়ারীরা, মাংসের গন্ধ! কসম খেয়ে বলতে পারি, রসালো মাংস... এ মাংস তুই কোত্থেকে পেলি রে কর্তা? বল তো শুনি।'

বাথতিগুল চুপ করে রইল। হাতশা চোখ তুললে না। আর লাল-দাড়ি লাফিয়ে উঠে কড়াই থেকে বাষ্পে ভেজা সতরঞ্চিটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিলে।

'ঠিকই বটে! ঢাকনিটা জায়গা মতো নেই দেখছি। টানটা মেরেছি বেমক্কা, ভেতরে কিন্তু খাসা মাল!.. তবে আর কি, বসে যাও হে অতিথিরা, ঠিক সময়েই এসে পড়েছ। নাও, নাও, হাত ধুয়ে নাও, সওয়ারীরা। হাতশা, রেকাব দাও গো, জলদি করে!'

সালমেনের দলটা বাইকে ঘিরে হুটোপুটি করে চেঁচামেচি লাগাল।

তিক্ত লজ্জায় হতভম্ব হাতশা এগিয়ে দিল একটা বড়ো রেকাব।

লাল-দাড়ি নিজেই মাংস ঢাললে, নিজেই কাটলে। সালমেন আর জন দশেক ষণ্ডা গণ্ডা লেঠেল আস্তিন গুটিয়ে হাত লাগালে নরম, চর্বিওয়ালা, ধোঁয়া ওঠা খণ্ডগুলোর দিকে।

ঠাট্টা করেও কেউ বাখতিগুলকে ডাকল না। একপাশে দাঁড়িয়ে বাড়ির কর্তা ঢোক গিলতে লাগল খিদেয়। পিঠ পাছা দিয়ে তাকে রেকাবি থেকে একেবারে ঠেলে সরিয়ে রাখল অতিথিরা।

ক্ষোভে ঘৃণায় মাটির দিকে তাকিয়ে রইল হাতশা। জীবনে সে অন্যায় কম দেখে নি, কিন্তু এমন কাণ্ড এই প্রথম!

সশব্দে চিবতে লাগল সওয়ারীরা, আর তাদের সঙ্গে বাই, দুগাল একেবারে ভরা... পেট ফেটেও মরে না হতভাগা!

চেঁছে মুছে ঝকঝক করে উঠল থালাটা। সালমেন একটা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে মাথা ফেরালে বাখতিগুলের দিকে:

‘এবার তোর ঘরদোর দেখা। দেখব কি লুকিয়ে রেখেছিস। ঘোড়ার লেজটাও ছাড়ব না, যদি ছাড়ি তো আমার বংশ নির্বংশ হবে। আমার সঙ্গে চালাকি করা চলবে না... সব গুটিয়ে নিয়ে যাব। নে, গা নড়া, চটপট!’

মনে হল, বাখতিগুলের পেটের মধ্যে সবকিছু খিদেয় যন্ত্রণায় জট পাকিয়ে গেছে।

‘ইচ্ছে হলে খুঁজে দেখো, খুঁজে পেলে নিয়ে যেও,’ দাঁত চেপে বললে সে। অপমানে কেঁপে কেঁপে উঠল বাখতিগুল,

আরো কী আছে কে জানে, বললে, 'চোখ পাকিয়ে, বোলচাল ঝেড়ে আমায় ভয় দেখাতে এসো না...'

সালমেন লাফিয়ে উঠে তার সর্পিল-হলুদ 'কামচা' দিয়ে দুবার আড়াআড়ি চাবুক কষলে বার্খতিগুলের ওপর... বার্খতিগুল হাতটা তুলেও ঠেকাল না। অপলকে তাকিয়ে রইল সে, ভালো করে ঘুম হয় নি তার, চোখের পাতা ফুলো ফুলো, জল টলটল করে উঠল সেখানে। অশ্লীল গালাগালি দিয়ে উঠল বাই।

এইটেই ছিল বার্খতিগুলের সবচেয়ে বড়ো ভয় — বৌয়ের চোখের সামনে, ছেলেমেয়েদের সামনে...

দুহাত বুকে তুলে তীক্ষ্ন কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হাতশা:

'খোদা তোর শাস্তি দেবে কজিবাক, অভিশাপে মরবি!'

ছোট্ট সৈয়দও ডুকরে চেঁচিয়ে উঠল:

'শুয়োর কোথাকার!' ঝাঁপিয়ে গেল সে সালমেনের বুকের দিকে।

বাই লাথিয়ে হটিয়ে দিলে তাকে। বার্খতিগুল আর সইতে পারল না, আত্মহারা হয়ে সে টুঁটি চেপে ধরলে অত্যাচারীর।

রাখালের চেহারা তখন ভীষণ, গায়ে তার পাঁচ জনার বল। সে মুঠি ছাড়ানো সহজ হল না সওয়ারীদের, সহজে ধাত ফিরল না বাইয়ের। প্রায় দম বন্ধ হয়ে রাগে হেঁচকি তুলে ফের গাঁক্‌গাঁক্‌ করলে সে:

'গারদে বসাব তোকে, যাবি কোথায়, ধরে আনব, কবর দেব তোকে... কয়েদে পাঠাব সাইবেরিয়ায়! না করি তো আমি বাপের ব্যাটা নই...'

কিন্তু গালমন্দ তর্জন গর্জন কিছুই আর তখন বাখতিগুলের কানে যাচ্ছিল না। পিটিয়ে মারা হচ্ছিল তাকে। চোখের সামনে তার ভেসে উঠছিল কেবল আঁকাবাঁকা ফুলকি আর তারা। তারপর আর কিছু নয়। সবেগে যেন তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হল এক সরু কালো অন্ধকূপের মধ্যে, পিঠে পেটে মাথায় ধাক্কা খেতে লাগল সে অন্ধকূপের দেয়ালে, কিন্তু তল যেন আর মেলে না।

গালের হাড়ে তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণায় মুহূর্তের জন্যে চেতনা ফিরল তার, মাড়ি যেন তার পিণ্ড পাকিয়ে গেছে। তারপর ফের অন্ধকার, তাওয়ার মতো তপ্ত তলাটায় বুক দিয়ে পড়ল সে।

তারপর আর কিছু মনে পড়ে না বাখতিগুলের।

৪

জ্ঞান ফিরল সহজে নয়, ঝাপসা রক্তের মধ্য দিয়ে সে তাকিয়ে দেখল হাতশার দিকে। এক রাত্রের মধ্যেই সাঙ্ঘাতিক শুকিয়ে গেছে সে, বুড়িয়ে গেছে। চাপা কান্নায় দম আটকে আসছে তার, গলার মধ্যে ডুকরে উঠছে। বৌয়ের গলার স্বরটাও যেন অচেনা।

হাট করা একটা ফাটল দিয়ে ম্লান আলো এসে পড়েছে ইয়ুর্তার ভেতরে, দরজাটা ভাঙা। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, চৌকাটের কাছে ঠিক ঘোড়ার কেশরের মতো শাদাটে ফেনা উঠছে দুলে।

গোঙিয়ে উঠল বাখতিগুল। এ আলো সে চোখ মেলে না দেখলেই বরং বাঁচত। দুর্ভাগ্যের আলো।

উনুন নিভে গেছে, ভারি মেষচর্মের কোটের তলে ঠাণ্ডায় কাঁপছে বাখতিগুল। সারা গায়ে যন্ত্রণা, গালের হাড়টায় কে যেন সাঁড়াশী দিয়ে টানছে। কষ্ট হচ্ছে হাতশার, মৃদু বিলাপ করছে সে, ধুয়ে দিচ্ছে মুখের ওপর জমাট বাঁধা রক্ত। সে মুখ যেন মানুষের নয়, আগাগোড়া এবড়োখেবড়ো রক্তরাঙা এক পিণ্ড। চোখ প্রায় ডুবে গেছে, গাল কাটা, সেখান থেকে এখনো রক্ত চোয়াচ্ছে, মেষচর্মের ওপর তা ঝকঝকে কালো কালো ফোঁটায় জমাট বেঁধেছে।

কোঁথাতে কোঁথাতে কষ্টে মাথা ফেরাল বাখতিগুল। কী যেন খুঁজছিল।

'নেই ... চলে গেছে সবাই, মুখপোড়ার দল ...' ফুঁপিয়ে বললে হাতশা।

'সৈয়দ ...' নিঃশ্বাস ফেললে বাখতিগুল।

'এখানেই ... হিম্মৎ আছে ছেলেটার।'

বাপকে শায়েস্তা করে লেঠেলরা ছেলেটার পেছনে লেগেছিল। সালমেন নিজেই ওর মুখ থেকে বার করতে চেয়েছিল কোথায় লুকিয়ে রেখেছে মাংস। ভয় দেখিয়েছিল খুন করবে। একটা কথাও বলে নি ছেলেটা। রাগে খেপে উঠেছিল বাই, ছেলেটা কিন্তু বোকার মতো হেসেই গেছে।

কান্না গিলে বললে হাতশা: লাল-দাড়িটা মশাল জেবলে কুত্তার মতো নাক বাড়িয়ে তল্লাশ চালায় চারিদিকে। মাংসটা বার করে ফেলে সে, গোয়াল ঘরে হপ্তার মতো যে মজুতটা

ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল সেটা, আর পাথর চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখা ছিল যেটা সেটাও। চামড়ার রঙ দেখে পালের লোকেরা বকনাটাকে সনাক্ত করে। সালমেন হুকুম দেয় সব গুটিয়ে নিয়ে যেতে, সেই সঙ্গে সেলামী হিসাবে আমাদের গরুটা আর সিভি ঘোড়াটাও। ঘোড়াটা নিয়েছে বাইয়ের পালের ক্ষতিপূরণে, গরুটা নিয়েছে অপমানের শোধ হিসাবে — আর মাংস নিয়েছে চোরাই মাল বলে, চোরাই মালে চোরের অধিকার নেই!

এসবের পর লাল-দাড়ি আর দুজন সওয়ারী মশাল নিয়ে বাখতিগুলের কাছে আসে। বসে বসে দেখে, কান পেতে শোনে।

সালমেন আসতে লাল-দাড়িটা তাকে আশ্বাস দিয়ে জানায়:

‘নিঃশ্বাস পড়ছে…’

সালমেন বলে, ‘এ গোলামের ঠাঁই ইয়ুর্তায় নয়, জেলখানায় মরতে হবে ওকে। আমার ভাই হবে ভলোস্ত হাকিম… সবাই তোমরা আমার সাক্ষী… আর্জি পেশ করে মোহর ছাপ করে দেব… চোরকে পাঠাতে হবে কয়েদে, হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে কুকুরের সওয়ারী করে! এই বলে দিলাম আমার কথা…’ এই বলে চলে যায় সবাই।

ছেলেমেয়েদের দিকে তাকাল বাখতিগুল। অবোধ অবল শিশু — ফের বেচারীদের কপালে উপোস, আঙিনার বুড়ো কুকুরটার ছানাপোনার মতো উপোস।

‘ছেলেদের জন্যে… আছে কিছু?’ জিগগেস করলে বাখতিগুল।

'কিছুই না... খুদটুকুও না,' বিলাপ করে উঠল হাতশা, 'একেবারে লুটে পুটে নিয়ে গেছে। দ্যাখ কেমন তছনছ করে দিয়ে গেছে ইয়ুর্তা... চালাটা পর্যন্ত কুপিয়ে গেছে... হুকুম দিলে বনশুয়োরটা! মর তুই, কবর তোর গোল্লায় যাক!..'

বাখতিগুল দাঁত কড়মড় করে ফের অচৈতন্য হয়ে পড়ল। দুপুর পর্যন্ত উদ্দাম ভুল বকল সে, আল্লার কাছে নাকি কোন হাকিমের কাছে ক্রমাগত বিড়বিড় করে, ধিক্কার দিয়ে জিগগেস করে গেল:

'তাহলে কি!.. বলুন, কে কার চুরি করলে?'

শয্যাশায়ী বাখতিগুল কয়েকদিন ধরে কেবলি ভাবলে, ভেবে ভেবে কূল পেল না সে: এখন সে করবে কি?

একা সে, কোনো আশা নেই তার। কজিবাকদের সঙ্গে একলা কি লড়া যায়? ওদের আউলে ন্যায় মিলবার নয়, কথাই বলবে না। বড়ো জাঁক ওই কসাইগুলোর। অন্যগুলো তো ভয়েই মরে, চুপ করে থাকবে। দুঃখের দিনে কার ভরসা? আপনজন ভরসা। কিন্তু কোথায় তারা? ক্ষয়িষ্ণু সারি বংশের এক কুড়ির বেশি ইয়ুর্তা নেই। তাও তারা সারা এলাকায় ছড়ানো, এককাট্টা করা যাবে না। ছাউনি পেতে ঘুরে বেড়ায় ধনী বংশগুলোর সঙ্গে সঙ্গে, তাদের জন্যে খাটে, নিজেরা মরে দুঃখে কষ্টে। কার ওপর তাদের কর্তাত্বি? কে মানবে তাদের কথা। না, ওদের মধ্যে এমন মালিক কেউ নেই নখাগ্র জমিটাও যার দখলে!

তাহলেও সারি বংশের লোকেরা যা মেনে নিয়েছে সেটা মেনে নিতে পারছিল না বাখতিগুল। হয়ত বা সে বেশি একরোখা, গোঁয়ার, কিন্তু তাতে তার কষ্টই বেশি, মুশকিল

বেশি। ভাই তেকতিগুল ছিল একটা ভ্যাড়ার মতো, নেকড়েয় খেলে তাকে। আর এই ছোট্ট ছেলে সৈয়দ — দিলটা তার বাপের মতো, ওরই মতো ধরন-ধারন। কপালে থাকলে, মানুষ হয়ে উঠত বাখতিগুল, ন্যায় মতে দিন কাটাত, ভরপেট খাওয়া দিত ছেলেমেয়েদের। আল্লা জানেন, বুদ্ধিতে সে খাটো নয়, জিভ তার আয়ত্তে। অনেক কিছুই হতে পারত বাখতিগুল... কিন্তু কপাল নেই তার, ন্যায় নেই। আর ঠিক ছোঁয়াচে রোগের মতোই আল্লা পাঠাচ্ছেন খিদে, পাঠাচ্ছেন অপমানের যন্ত্রণা।

এবার তো একেবারেই কাহিল। এখন থেকে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে সালমেনের চক্ষুশূল। যা ঘটল এত সবে শুরু, বোঝাই যাচ্ছে শেষ কী দাঁড়াবে! কজিবাকরা তো আপ্রাণ চেষ্টা করবেই। পেছনে ওদের সরকার: হাকিমও নিজেদের লোক, কাজীও নিজেদের। একই দলের লোক, একই গাছের ঝাড়। একবার যখন বাখতিগুলকে হাতে নাতে ধরেছে, তখন সত্যি মিথ্যা সবই চাপাবে ওর ঘাড়ে, সবচেয়ে আগে চাপাবে ওর ঘাড়ে, সবচেয়ে আগে চাপাবে নিজেদেরই কুকীর্তিগুলো। নিজেরাই চুরি করবে, আঙুল দেখাবে বাখতিগুলের দিকে। মহা আতঙ্ক, মহা লজ্জা, মহা বিপদের ব্যাপার জেলখানা, সেই জেলখানাতেই তখন পাঠাবে তাকে।

দুনিয়ায় বাখতিগুল সবচেয়ে বেশি ভয় পায় জেলখানা।

জানত সালমেন, কী ভয় দেখাতে হয়। 'বারিমতা'র নৈশ অভিযানের হাতাহাতি লড়াইয়ে বাখতিগুল মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে কম নয়, কিন্তু বুক তার কাঁপে নি। আর এখন সে কেঁপে কেঁপে উঠছে কম্পজ্বরের মতো। জেল... সে যে একটা

করাল সমাধি গহ্বর... ওকে চায় জীবন্ত কবর দিতে। সে তুলনায় তেকতিগুলের কপাল বরং ভালো।

আর যেই হোক সালমেন কখনো খামোকা হুমকি দেবে না। অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্যে সে ঢিট করবে বেয়াড়া গোলামকে, টেনে নিয়ে যাবে জেলখানায়।

'কী করি এখন?' নিজের মনেই বলে উঠল বাখতিগুল, হতাশায় গড়াগড়ি দিতে লাগল মাটিতে ফাঁদে পড়া জন্তুর মতন, বৌ ছেলেমেয়ের সামনেও লজ্জা হল না তার।

হাতশা ভাবলে স্বামীর ফের প্রলাপ শুরু হয়েছে, প্রাণপণে সে খোদার নাম নিতে লাগল:

'হাই খোদা, মরতে দিও না ওকে... সহ্য করার শক্তি দাও খোদা!..'

একদিন একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ল সে। হাতশাকে ডেকে সে এমন সব কথা কইতে লাগল যা সে আগে প্রাণ গেলেও বলত না।

'না বৌ... জোর যার মুলুক তার... সব গেল!..'

এই প্রথম হাতশার ভয় হল স্বামীর জন্যে।

'সত্যিই কি কেউ নেই, যার কাছে আর্জি চলে?'

জবাব দিল না বাখতিগুল, কি যেন ভাবল। বোঝা গেল কিছু একটা সংকল্প করেছে সে! হাতশা সেটা দেখেই বুঝল। আর গোঙালে না বাখতিগুল, ভুল বকল না। চুপ করে ঘা-ঢাকা বুকের ছাতিটা টিপে দেখল।

এক হপ্তা কেটে গেল, খাড়া হয়ে দাঁড়াল বাখতিগুল। আর যেভাবে সে উঠে দাঁড়াল তাতে হাতশা বুঝলে, ভুল হয় নি

তার। ফের লম্বা পথে পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি হল বাখতিগুল।

কজিবাক ডাকাতেরা তার বিশ্বাসী অভিজ্ঞ ঘোড়া সিভিকে নিয়ে গেছে। তবে আরো একটা ঘোড়া ছিল বাখতিগুলের, সিভির চেয়ে খারাপ নয় — তেজী দৌড়বাজ ঘোড়া, বিশ্বাসী এক বন্ধুর কাছে তা লুকিয়ে রাখা ছিল ভবিষ্যতের আশায়।

খাসা ঘোড়া, শুকনো সুঠাম লালচে-বাদামী চেহারা, চওড়া বুক, সরু সরু ঠ্যাং। অপার স্তেপ এলাকায় সবচেয়ে হাঘরে রাখালেরও হয়ত দু-তিনটে ঘোড়া আছে, কিন্তু এমন ঘোড়া পেলে অনেক বাই-ও বর্তে যাবে। হয়ত বা কেবল ভলোস্ত হাকিমই এমন ঘোড়ায় চেপে যায়।

বাদামী ঘোড়াকে জিন পরানো শুরু হল। ভোর বেলায় বাখতিগুল তার সেকেলে গাদাবন্দুকটি ঠিকঠাক করে নিলে, গালের ক্ষতটায় চর্বি মাখিয়ে তাতে মাকড়সার জালের প্রলেপ লাগাল। সৈয়দের হাত থেকে লাগাম নিয়ে বিদায় জানাল মাথা নেড়ে। ঘোড়া তাকে নিয়ে গেল পাহাড়ের চুড়োয়, বনগুলোর মাথা ছাড়িয়ে দুর্ভেদ্য একটা এলাকায়।

ছোটো ছোটো কারাচাই ঝোপ আর কাঁটা গাছের ভেতর দিয়ে এগুতে সময় লাগল কম নয়, দুর্ভেদ্য জঙ্গল থেকে বেরতে বেরতে দুপুর হয়ে এল। এবার সামনে তার অবারিত হয়ে উঠল উঁচু হয়ে ওঠা ন্যাড়া শৈলপাহাড় — রক্তের মতো টকটকে লাল।

মাথা তুলে তার দিকে চাইলে অজান্তেই শরীরটা গুটিয়ে আসে। সেদিকে এগিয়ে যাওয়াই দুষ্কর। মনে হয় তাদের যুগ

যুগের অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করাটা পাপ। মানুষ নেই এখানে, ঘোড়া গরু কিছু নেই। শুধু লালচে পাথর চারিদিকে — স্বাধীন বুনো জন্তুর সনাতন আশ্রয়। কিন্তু শিকারীরা এখানে আসে কদাচিৎ। পথ করে আসাটাই কঠিন, বেরুনো আরো দুষ্কর।

পাথুরে দানবটার দিকে ধীরে ধীরে এগুল বাখতিগুল, নিঃশব্দে নেমে ছায়াচ্ছন্ন একটা খাদের মধ্যে ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখলে, মাথা থেকে টুপিটা খুলে তা পোষাকের তলে গুঁজলে, বেল্ট দিয়ে বন্দুক বেঁধে নিলে পিঠে, তারপর উঠতে লাগল পাহাড় বেয়ে। পেশীতে চাড় পড়ে গালের ক্ষতটা থেকে রক্ত চোয়াতে লাগল, একটা লোনা চটচটে ধারায় তা এসে পেঁছিল মুখে। জিভ দিয়ে চেটে নিল বাখতিগুল।

পাথরের ন্যাড়া মাথায় এসে দেহের গোটা খাঁচাটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে সে দম নিলে একেবারে ক্লান্ত ঘোড়ার মতো।

নিচ থেকে যা দেখা যায় নি, সেই বিস্তৃত ধূসর পাথুরে খোঁদলটা চোখে পড়ল তার। বাখতিগুল জানত, তার ওপারে পাথুরে নুড়ি ভরা ন্যাড়া ধাপ ধাপ ঢাল নেমে গেছে, জায়গাটা বুনো ছাগলের প্রিয় জায়গা, পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য পশুপথের টানাপড়েন কাটাকুটি করে গেছে সেখানে।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পাথরের মাথার দিকে নজর করলে বাখতিগুল। খোঁদলটার ওই দিকে, বুনো খাড়াইটার ওখানে কেউ নেই। সবকিছু স্তব্ধ, কিছুই নড়ছে না, কিছুই ঝলক দিচ্ছে না। দৃষ্টিহীন বধির এক শূন্যতা... কতবার বাখতিগুল প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এসেছে এখানে, পাথরের খোঁচায় আঁচড়

খেয়ে হামাগুড়ি দিয়েছে, কিন্তু ফল কিছু হয় নি, অখণ্ড দেহে বাড়ি ফিরতে পারলেই কৃতার্থ বোধ করেছে! আজ কিন্তু সে খালি হাতে ফিরতে পারবে না। আজকে তাকে বাঁকা পাথরকেও সিধা করতে হবে।

চারপাশের পাথরগুলোর মতো আকাশটাও ছাই-রঙা, গোমড়া-মুখো। আর ছাই রঙের তালি মারা আলখাল্লায়, রক্তহীন মুখে, রোগাটে হাড্ডিসার চেহারায় বাখতিগুলকেও দেখাচ্ছিল ঠিক পাথরের মতোই, বন্দুকটা নিয়ে সে ঠিক টিকটিকির মতোই নিঃশব্দে অলক্ষ্যে এগুতে লাগল খোঁদলটার চুড়ো বরাবর। পাহাড়! পাহাড়! ভিক্ষে দাও কিছু কাঙালকে!..

বেলা গড়িয়ে এল, খোঁদলটার ওপাশে গিয়ে পেঁছিল বাখতিগুল, চোখে পড়ল ছাগলের পায়ের দাগ...

পোড়া কপালেরও তবে কপাল খোলে। ঠিক বাখতিগুলের নিচেই লম্বা ঢেউ তোলা ঢালের ওপর ছেয়ে পাথুরে স্বচ্ছ কুয়াসার মধ্যে ঠিক যেন ভেসে আছে তিনটে আরখার — ঝাঁকড়া লোমো খাড়া শিঙওয়ালা একটা মর্দা বুনো ছাগল, বেঁটে-লেজ ধারালো-খুর তার দুই মাদী। সবেমাত্র থেমেছে তারা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখছে সেই দিকটায় যেদিক থেকে ছুটে এসেছে, ভয়ানক সতর্ক, সজাগ, চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ছুটে অদৃশ্য হয়ে যাবার জন্যে তৈরি। সত্যিই যেন ওদের ঝাঁকড়া লোমো গাগুলো স্প্রিঙে গড়া, ডানা মেলা।

‘তবে এবার আল্লার নামে...’ নিঃশব্দে ঠোঁট নড়ল বাখতিগুলের, বুকের তল থেকে গাদাবন্দুকটা টেনে বার করে বাগিয়ে ধরল।

তাক করল সে মর্দাটার দিকে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে হাত কেঁপে গেল, নলটা এগিয়ে আসতেই নজরে পড়ে গেল ছাগলটার। দ্বিতীয় বার তাকিয়ে দেখা ভীরুর নিয়ম নয়। কিছু একটা অস্বাভাবিক টের পেতে না পেতেই প্রচণ্ড লাফ দিয়ে অনায়াসে ধাপ ধাপ ঢালুটার নিচের দিকে সরে গেল ছাগলটা। ছাগলীগুলোও তিড়িং লাফে এগুল তার আগে আগে।

ততক্ষণে হাত শক্ত হয়ে এসেছে বাখতিগুলের, ছাগলটাকে তাক করল সে বন্দুকের মাছিতে। নিজের মাদীগুলোকে ডাক দেবার জন্যে উঁচু পাথরের ওপর ছাগলটা লাফ দিতেই দুম করে আগুন ছুটল বন্দুকের নলে। পাথরগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল নীলাভ ধোঁয়ার মেঘ, আর সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে বাখতিগুল দেখতে পেলে লাফ দেওয়া ছাগলটা মাথা নিচু করে উলটে পড়ছে।

নিজের দিকে দৃকপাত না করে বাখতিগুল নিচে নামতে লাগল, ভয় ছিল তার শিকার হয়ত উঠে পালাবে। আরখার কাত হয়ে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। বাখতিগুল ছুরি নিয়ে গলায় বসিয়ে দিলে। ছাই রঙের পাথরের ওপর গড়িয়ে পড়ল টকটকে লাল রক্ত। কয়েকবার খিঁচুনি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ছাগলটা। বাখতিগুলও ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে এলিয়ে পড়ল তারই সঙ্গে।

তারপর সে ছাল ছাড়ালে শিকারের, নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেললে, লাসটাকে দুভাগ করে ছাল দিয়ে বেঁধে নিলে মাংসটা। ফাটল ধরে খাড়াই পথ বেয়ে সে নিয়ে এল তার বাদামী ঘোড়া,

বহু কষ্টে বোঝাটা ঠেলে তুলল তার পিঠে, চুলের ফাঁস দিয়ে বাঁধলে ভালো করে।

কারাচাইয়ের ঘন ঝোপের ভেতর সেঁধতে সেঁধতে জিনের ওপর একটু জিরিয়ে নিলে বাখতিগুল। কিন্তু এ পথ তার ঘরমুখো নয়...

সন্ধ্যার দিকে বাখতিগুল নেমে এল একটা ছায়াচ্ছন্ন, গাছপালায় ঢাকা উপত্যকার মধ্যে। এইখানে নদীর পারে বসত পেতেছিল এক ধনী আউল। পাশের চেলকার ভলোস্তের হাকিম জারাসবাইয়ের আউল।

জারাসবাইয়ের নামডাক শুধু তার নিজের ভলোস্তে আর নিজের লোকজন কর্মচারীর মধ্যেই নয়, গোটা উয়েজদে তার চেয়ে নামী হাকিম কি মির্জা, হাজি কি বাই আর মিলবে না। মালিক, সওদাগর, লড়ুইয়ে — সব হিসাবেই তার খ্যাতি। ধন-দৌলতে, ইমানে, মগজে তার সঙ্গে পাল্লা দেবার সত্যিই কেউ ছিল না।

এমন লোক যেমন ভালো করতে পারে তেমনি মন্দ, মুঠো ভরে সে দিতে পারে যেমন কু, তেমনি সু!

আউলের দিকে যেতে যেতে বাখতিগুল ভাবলে, 'একবার কপাল ঠুকে দেখি... এমন হন্যে হয়ে দিন কাটানো আর সয় না...'

বোঝা গেল, এখানে নদীর পারে জারাসবাই শীত-কাটাবার আয়োজন করছে। শরতের ঠাণ্ডার ভয়ে আউলের অনেক লোকই ইয়ুর্তা ছেড়ে ইতিমধ্যেই ডেরা নিয়েছে শীতের মেটে ঘরে। সন্ধ্যার গোধূলিতে সবাই বেরিয়ে এসেছে বাইরের আলোয়।

সবচেয়ে বড়ো ঘরখানার ফটকের কাছে দামী ফার টুপি আর ধবধবে নরম লোমের ওভারকোট পরা লম্বা মোটা একজনকে দেখতে পেল বাখতিগ্বল। ম্বখটা তার লালচে, ঘামে চকচক করছে, কিন্তু ভাবটা বেশ ভারিক্কী, বেশ জমকালো। জারাসবাই! বয়সে সে বাখতিগ্বলের চেয়ে বড়ো নয়, কিন্তু তার ধারে কাছেও সে লাগে না... তাকে ঘিরে আছে এক প্বরো মোসায়েব দল, সম্মানী দ্বজন ম্বর্বিব, বছর সতেরোর এক হৃষ্টপ্বষ্ট ছোকরা — তারই বড়ো ছেলে, সেই সঙ্গে ছোকরা ব্বড়ো এক দল পোষ্য, ঠিক যেন ময়দার শাদা প্বঁটলি ঘিরে একদল ইঁদ্বর।

যথাযোগ্য সম্মান করে সেলাম জানালে বাখতিগ্বল। ভলোস্ত হাকিম আরখারের প্যাঁচালো শিঙের দিকে নজর করে উদারভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিলে। তা শ্বর্ব হিসাবে মন্দ নয়।

কুমগান অর্থাৎ সর্ব গলার কলসী নিয়ে ফটক থেকে বের্বল বাইবিশে — বাইয়ের প্রথম পক্ষের বৌ — ফিটফাট, ফরসা ম্বখ, ছিমছাম চলন। শিঙওয়ালা খাসা ছাগলটির রক্তমাখা ম্বণ্ড দেখে তারও কৌতূহল জাগল। ধীরে ধীরে ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে এল সে, আনন্দে জিভ দিয়ে চুমকুড়ি কাটল। তার পেছন পেছন অন্যান্য কৌতূহলীরাও বাদ গেল না।

বাখতিগ্বল সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ালে বাইগিন্নির উদ্দেশে।

'তা এই জীবটিকে দেখছি পছন্দ হয়েছে আপনার? আজ সকালে আসছিলাম আপনাদের আউলে, মনে হল অনেক দিন নিশ্চয় ব্বনো আরখারী মাংস আপনাদের খাওয়া হয় নি... তাই চলে গেলাম পাহাড়ে... তা ওই যেমন তেমন একটা মারা গেল... ঘেন্না আপত্তি না থাকলে এ সবটাই নিন গো...'

বাইগিন্নি চকিতে একবার চপল দৃষ্টিপাত করলে স্বামীর দিকে, যেন মত চায় তার, ভয়ও আছে পাছে আপত্তি করে বসে। মনে মনে হাসল বাখতিগুল, আপত্তি আর করতে হবে না।

'তা কি আর করবে… নাও…' আলস্যে মত দিলে জারাসবাই, তারপর চোখ মটকে আশেপাশের লোকেদের বললে, 'জানোয়ারটা তো আমাদেরই পাহাড়ের, নিজে থেকে না দিলে ছিনিয়েই নিতাম!'

হেসে উঠল সবাই, বাখতিগুল হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

মুরুব্বিদের একজন অধীর হয়ে বললে:

'আহ্ কোথায় গেল মেয়েগুলো! নিয়ে যাক মাংসটা…'

বাখতিগুল আন্দাজ করলে এই লোকটিই কাইরানবাই, কৃপণ হিসেবী বুড়ো; জারাসবাইয়ের লোকান্তরিত বাপের দোস্তবন্ধু, এখন তার সমস্ত পশুপালের দেখা শোনা করে, লোকে বলে হাকিমের সে ডান হাত।

'না, না ও কিছু ভেব না কাদিশা,' বাইগিন্নিকে হড়বড় করে বললে কাইরানবাই, 'লোকটা যখন কজিবাকদের মুখে কালি দিয়েছে, তখন লোকটার হাতের ছোঁয়া সবই পতিত, সবই হীন তা ভাবছ কেন! ঘেন্নার অছেদ্দার কিছু নেই। মনের মতো লোক হলে এ বেচারি তার শেষ ঘোড়াটাও দিয়ে দিতে পারে। একটু একগুঁয়ে তা বটে, তবে বাহাদুররা তো গোঁয়ারই হয়…'

খুশি হয়ে বাখতিগুল মাথা নুইয়ে সেলাম জানালে তাকে:

'ধন্যি হলাম বাপ! বলবার কি আছে, যা বলবার তুমিই তো সব বললে! গোঁয়ার হই, একরোখা হই, কপালে আমার

সুখ নেই গো। বুকের ভেতর যা টগবগ করছে সব বলব ভেবেছিলাম মির্জার কাছে... কিন্তু তোমার জ্ঞান বিদ্যার সামনে চুপ করেই থাকি গো। আমার ভেতরটা তো সবই তুমি দেখছ। তুমি যা বলবে তাই হোক!'

হাকিমের ছেলে হাঁক দিলে দুটো মেয়েকে, তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে লাশটা নামিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল ঘরে, আর বাড়বাড়ন্ত ছেলেটি আরখারের মুণ্ডটা পেটের ওপর ধরে শিঙ দিয়ে গুঁতো মারতে লাগল মেয়েদের পিঠে।

বাখতিগুলকে একটি কথা না বলে জারাসবাই মুরব্বিয়ানার চালে দেখতে লাগল সোরগোলটার দিকে। সওয়ারীকে অসম্মান করার ইচ্ছে হয়ত তার ছিল না, কিন্তু পথের যে কোনো লোকের সঙ্গে আদিখ্যেতা করা তো আর ভলোস্ত হাকিমের শোভা পায় না। কী আর এমন লোক, কী আর এমন ভেট!

তবে দ্বিতীয় মুরুব্বি দরদ দিয়েই চাইলে বাখতিগুলের দিকে। লোকটার নাম সার্সেন, ভলোস্তের সবচেয়ে বুড়ো কাজিদের একজন। জারাসবাই বরাবরই আদালতের নির্বাচনে তার পক্ষই নিত, কদর করত তার বহু বছরের অভিজ্ঞতা, আর তার চেয়েও বড়ো কথা, জানত হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে তার জানাশোনা অনেক।

ভলোস্ত হাকিম আর সার্সেন কেউ কারো ছোটো নয়।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে সার্সেন বললে, 'বেচারী লোক... ভাবনা যদি ভালো হয় তো অর্ধেক কাজ হাসিল। মনে তোর দেখছি ভালো আছে কম নয়। তা আর কি, আগেও এমন হয়েছে: তোর মতোই দুঃখী লোক, কষ্ট ভুগে ভুগে পাগলার

মতো ছেড়ে পালিয়েছে নিজেদের আউল। সে কথাটা ভেবে দেখেছিস তো?’

‘যা বলেছেন মুরুব্বি!’ ভলোস্ত হাকিমের দিকে কটাক্ষে চেয়ে বললে বাখতিগুল। ‘অনেক কথাই ভেবেছি গো, অনেক জ্বালায় এসেছি... আপনাদের দয়া পেলে সুদে আসলে তা শোধ দেব, দেহে যত সাধ্যি আছে!’

হাকিম সামান্য চোখ তুললে। শেষ পর্যন্ত কথা কইলে বাখতিগুলের সঙ্গে:

‘ঘোড়ার পিঠে চেপে যা বললি, তা ঠিকই বললি। শুনব এবার খানার সামনে কি বলবি। চল গোঁয়ার...’

খুশি হয়ে বাখতিগুল চলল বাইয়ের পেছন পেছন।

‘সত্যি মির্জা, আসতে না আসতেই একরাশ বাখানি করলাম, তবে বুক যে আমার টন টন করছে।’

‘আহ হা... বাহবা... সাবাস...’ বাইয়ের মেজাজ দেখে একসঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল মোসায়েবরা।

গৃহকর্তার পেছন পেছন পর পর যে যেমন মুরুব্বি সেই ভাবে আঙিনায় ঢুকল তারা, তারপর জমকালো উঁচু বাড়ির ভেতরে।

হামেশা এমন বাড়িতে ঢোকা বাখতিগুলের কপালে হয় নি, সারা জীবনে হয়ত একবার কি দুবার। চৌকাটের কাছে সে একটু থমকে গেল। ঝকঝকে প্রকাণ্ড গরম ঘরখানায় ঠিক সূর্যের মতো জ্বলছে কেরোসিনের আলো। ঘরের সম্মানের আসনটিতে, বাইয়ের অদ্বিতীয় ‘তোর’টিতে স্তূপাকৃতি হয়ে আছে নানা রঙের কম্বল। চৌকাট থেকে সেদিক পানে চলে

গেছে একটা লাল গালিচা, তাতে পা দিতেই ভয় হয়। ডান দিকে ঝকমকে নিকেল করা রুশী পালঙ্ক, তার ওপর দেয়াল জুড়ে আরো দামী নক্সী গালিচা। সবকিছুই জ্বলজ্বল করছে, ঝলমল করছে বসন্তের শিশিরে ফুলে ভরা মাঠের মতো।

কালোকুলো ঠাণ্ডা ক্ষেতমজুরের ইয়ুর্তা তার, ছেঁড়াখোঁড়া চাটাই পাতা — তেমন ঘরের লোক হয়ে এমনি ধারা এক বাড়িতে ঢুকতে পাওয়া — এটা বাখতিগুলের কাছে মনে হল এক বিরল সম্মান আর এখানে রাত কাটাতে পারা তো এক অপার সৌভাগ্য। আর যখন তাকে বসানো হল অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে একত্রে বাইয়ের ভূরিভোজনের সারিতে, তখন সে প্রায় ভুলেই গেল যে সে ক্ষুধার্ত, যদিও মুখ তার লালায়িত হয়ে উঠেছিল। খেলে সে সংযতভাবে, সবাই বেশ দেখল এ সংযম সে বজায় রাখছে কী কষ্টে। খোদার শুক্র্, বাইগিন্নি পরিবেশনে কার্পণ্য করে নি। মান্যি করে ধন্যবাদ জানিয়ে বাখতিগুল বলে চলল তার বলার কথা... বলেই চলল সে, জ্বালার কথা, কষ্টের কথাগুলো তার যেন বেরিয়ে আসতে লাগল আপনা থেকেই।

শুনলে সবাই মন দিয়ে, আগ্রহ ভরে, যেন এমন কথা শোনে নি, এমন ঘটনা দেখে নি। আর ভয়ংকর সেই কথাটা, জেলখানার কথাটা যখন উচ্চারণ করলে বাখতিগুল, তখন বাইগিন্নি চেঁচিয়ে উঠল, হায় হায় করে উঠল মেয়েলী ধরনে, আর বয়স্ক পুরুষেরা ভ্রূকুটি করে মাথা নাড়ল। সার্সেন বাই হাত দিলে তার দাড়িতে। স্তেপবাসীরা স্তেপের লোকের মরণ কামনা করতে পারে, কিন্তু জেলখানা নয়... মনে মনে অবাক

লাগল বাখতিগ্লের, এমন দয়াল্ বাই এরা, ব্ঝছে, অন্যায়টা মানছে! এই বাড়িটা, এই খাবার দাবার, এই আপ্যায়ন, সবই স্বপ্ন নয় তো?

'নাঙ্গা আমি, অনাথ আমি...' বললে বাখতিগ্ল, 'পাল ছাড়া বাছ্রের মতো... একমাত্র আশা সবলের আশ্রয়, মায়ের ব্কে ঠাঁই নেওয়া। তার জন্যে সব দিতে পারি, সবেতেই রাজী!'

বাইয়ের বেটা জানগাজি আর বাইগিন্নি ঘরের আদ্রে মান্ষ, তারা ম্র্ব্বিদের অপেক্ষা না করেই খোলাখ্লি গালমন্দ করতে লাগল কজিবাকদের। নামকরা লেঠেল বাখতিগ্লের ওপর থেকে ছেলে আর গিন্নির চোখ সরছিল না। চাকর হিসাবে, সহায় হিসাবে এমন লোককে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

সার্সেন বাই কর্তার আগেই কথা বললে:

'তা বেশ বাহাদ্র, দেখছি তোর ম্খে কি, মনে কি। কান্না থামা, হাকিমের শরণ নে। ব্ক বাঁধ! তোর মতো ঘা-খাওয়া মার-খাওয়া লোক, চটপটে, করিৎকর্মা, দৈত্য দানো কারো পরোয়া করিস না, এমন লোকই কর্তার দরকার... ভালো করে কাজ করিস, কর্তার ছোটো ভাইয়ের মতো থাকবি, কর্তার ছেলে তোকে চাচা বলবে, ঘরের লোক হয়ে যাবি। মোচ পাকিয়ে ঘ্রবি তখন! কর্তার আশ্রয়ে কোনো মামলা কোনো হ্কুমেই তোর গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। খোদ শাদা চামড়া জারও তোর গায়ে হাত দেবে না! আর আল্লা দেন তো, আজ নয় কাল দ্ষমনের মোকাবিলাও করে নিবি, অন্যায়ের শোধ তুলবি, তাগদ দেখাবি।'

বাখতিগুল শুনছিল, নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছিল না তার। এত দয়া কেন? কিসের ইঙ্গিত করছেন অমন মান্যি গণ্যি কাজী? 'ঘরের লোক হয়ে যাবি... আজ নয়ত কাল...' বাখতিগুল জানত কজিবাকরা বহুদিন থেকেই জারাসবাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। গোটা উয়েজদের দুই প্রান্ত, দুই তীর, দুই পাহাড় হল এ দুই বংশ। খামোকা বাখতিগুল এখানে আসে নি। কিন্তু জারাসবাই হবে অভাগা এক পলাতকের ভাই, এ কি সত্যি? এতটা বাখতিগুল আশা করে নি। কপাল তাকে তার কামনার অতিরিক্ত দিয়েছে।

কয়েদখানার আতঙ্কে সে ছুটে এসেছিল, উদ্ধার কর্তার গোলাম নফর হতে রাজী ছিল সে। আর তার দিকে কিনা বাড়িয়ে দেওয়া হল হাত, স্তেপে যেন তার মান মর্যাদা এখনো ফুরোয় নি!

তবে জারাসবাই অত তাড়াতাড়ি মুখ খুললে না। আগের মতোই সবকিছু শুনলে যেন কান না দিয়ে। তার দাম্ভিক উপহাসে ভরা মুখ দেখে বোঝা যায় না কি সে ভাবছে। তবু ভাগ্যি, থামিয়ে দেয় নি, শুনেছে... গরিবের ধৈর্য পরখ করতে চায় নাকি, শুধু তাই করলেও ভাগ্যি। নাকি টলে উঠেছে? শুনে শুনে শেষ পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে নেবে। ডেকেও নেবে না, ফিরিয়েও দেবে না...

সে সন্ধ্যায় বাখতিগুল ভেবে পেল না কি বলবে বাই। হাসিঠাট্টা করে শুতে গেল হাকিম, অতিথি অভ্যাগত মোসায়েবদের শান্তিতে বিদায় দিলে, বাখতিগুলের দিকে

আগের মতোই সামান্য একটু মাথা নাড়লে। খুশি হয়ে বিদায় নিলে সবাই: বাইয়ের মন ভালো আজ, মেজাজ শরীফ।

সকাল থেকেই হাকিমের বাড়ির সামনে প্রার্থীর ভিড় জমতে লাগল। সংখ্যায় তারা অনেক। বাখতিগুল বাদামীর পিঠে জিন চাপিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল, বুঝিয়ে দিলে যা হুকুম হোক, সে তৈরি, যেতেও পারে, থাকতেও পারে। সকালের চায়ের পর বেরিয়ে এল হাকিম। চোখের দৃষ্টিতে মিনতি করল বাখতিগুল, 'আশা দিন গো কিছু...' জারাসবাই কাছ দিয়ে চলে গেল তাকে নজর না করে। বাখতিগুল অপেক্ষা করে রইল। হাকিম সবাইকে বিদায় দিলে বাখতিগুল ফের দেখা দিল বাইয়ের সামনে।

'কি রে বাপু, কি চাই তোর?' ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে জিগগেস করল হাকিম।

বাখতিগুল সোজা হয়ে এগিয়ে গেল।

'কসম খেয়ে বলছি, জান দিয়ে খাটব! যেখানে হুকুম হবে যাব, যা চাইবে, করব। ছোটো ভাইয়ের মতো থাকব, চাচা হব তোমার ছেলের... শাদা-দাড়ি সার্সেন তো তাই বললে!'

'ও কথা বহুৎ হয়েছে,' শুকনো গলায় বললে হাকিম, 'কসম তোর মনে রইল। তবে খানিক সবুর করতে হচ্ছে, হৈচৈটা কমুক, গালগুজব থামুক। এখন কজিবাকদের নিয়ে ঝামেলা করার সময় নেই, আজেবাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া শুধু। সময় হোক, আমি নিজেই তোকে ডাকব, ঘুমতেও দেব না! দেখব, কেমন কসম মান্যি করিস... আপাতত, আমাদের

সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িস না, ঘন ঘন আসিস। বাড়ির লোকেরা তোকে পছন্দ করেছে, কাজকর্মে সাহায্য করিস, ওরাই তোকে কাজ দেবে। পরে তোকে উচিত মতো চাকরি দেব। এখন যা।'

এতই খুশি হল বাখতিগুল যে ধন্যবাদের ভাষাও জোগাল না।

'মেহেরবান হাকিম তুমি ... আপন বাপের চেয়েও বেশি ... ভেবেছিলাম না করবে ... ছোটো মুখে চড়া কথা মাপ করে দিও ...' ঘোড়ার লাগামটা টানল বাখতিগুল, তেজী মাথাটা উঁচু করলে ঘোড়া। 'তোমার আদর, তোমার আপ্যায়নের জন্যে ... আর কি ... খোদার কাছে আমার জবাব নেই ... এ ঘোড়ায় বসাতে চাই তোমার ব্যাটা জানগাজিকে! পর যখন আর নই, তখন আমার বাদামীকে ওই নিক, চালাক ...'

হাকিম চুপ করে রইল, সায়ও দিয়ে না, আপত্তিও করলে না, তবে তাকাল অনুমোদনের দৃষ্টিতে, আর বাখতিগুল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জোরে জোরে ডাকতে লাগল জানগাজিকে। ঝড়ের মতো দৌড়বাজ ঘোড়া, দুর্লভ ঘোড়া। এ ঘোড়া দান করতে আনন্দ তাই বেশি।

বাইয়ের ছেলে ঠিক তার বাপের মতোই আপত্তিও করলে না, ধন্যবাদও দিলে না, তবে দেখে বোঝা গেল, খুশি হয়েছে বেজায়। তা বলতেই হবে বৈকি — বয়স হয় নি, এখনো ফাজিল ফক্কড়, কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে সেয়ানা!

বাখতিগুলকে খালি হাতে বিদায় দিলে না বাইগিন্নি — রশুন দেওয়া ঘরে তৈরি পুরুষ্টু সসেজ দিলে তাকে, নিজেই

বেছে বেছে তুলে দিলে বড়ো বড়ো কয়েক টুকরো সুস্বাদু ঘোড়ার মাংস। খুশি মনে বাড়ি ফিরল বাখতিগুল।

দুদিন পরে তার ইয়ুর্তায় এল জানগাজি, বসলে, কথা কইলে। বললে, বাপ আদাব জানিয়েছে। তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাদামীর বাঁধন খুললে, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল নিজের আউলে। খাসা ছুটলে ঘোড়া, উড়ে গেল যেন বাজপাখির মতো।

৫

শুরু হল একটা অদ্ভুত, অনভ্যস্ত সহজ জীবন।

প্রথম শীতটায় ভলোস্ত হাকিম বাখতিগুলকে আড়ালে রেখেছিল, নিজের কাছারিতে তাকে ঘেঁসতে দেয় নি। বলাই বাহুল্য, বাখতিগুল তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকে নি, তবে উপোস করতে হয় নি, হেনস্থা সইতে হয় নি। তার আগের দিনের অপমানের কথা আস্তে আস্তে ভুলতে লাগল লোকে।

ভলোস্তের 'আতকামিনেরদের' অর্থাৎ হোমরা-চোমরা বাইদের, পদাতিকদের মধ্যে যারা সওয়ারী, তাদের বড়ো বড়ো আসরে জারাসবাই তার নতুন চাকরের তারিফ করত আড়ে-ওড়ে। বলত তার দুঃখু, তার দুর্ভাগ্যের কথা, কত সে সহ্য করেছে। সার্সেন আর কাইরানবাই সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকে পোঁ ধরত, হাকিমের গুণগান করত তার সাধু কাজের জন্যে। রাতের ডাকাতকে শান্ত শিষ্ট মেহনতী করে তুলেছে, এ কি কম কথা! নির্মম নিষ্ঠুর বুকের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে দয়ামায়া।

'সৎ পথে চললে... মানুষ হবে না কি...'

আতকামিনেররা তাদের ঘোড়ার পালগ্নলোর মতোই ম্নটকো, তাদের বংশের মতোই উদ্ধত, তব্ন ফেরারী নফরের দিকে তারা চাইত মন দিয়ে। মান্যিগণ্যিরা কথা কইত তার সঙ্গে, পিঠে চাপড় দিত। আর যাদের টনটনে জ্ঞান তারা ব্নঝত: পালোয়ানটাকে জারাসবাই রেখেছে কোনো মতলব নিয়ে।

বাখতিগ্নল কিন্তু কোনো কাজ পায় নি, দিন কাটত কুড়েমিতে। আলসেমির জীবন তার কাছে কষ্টকর — চিলের চাই ওড়ন, ঘোড়ার চাই ধাবন। প্রাণপণে সে জারাসবাইয়ের আউলের জন্যে খাটার চেষ্টা করল। যে কাজটাই হাতে নিত, করত একেবারে নিপ্নণ হাতে, যদিও গর্ন ঘোড়ার দেখাশোনা করা ছাড়া জীবনে সে আর কিছ্নই করে নি। কিন্তু আউলে এই টুকিটাকি — এ কি আর কাজ! এত মেয়েরাই সেরে নেবে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা আউলে ছ্নটোছ্নটি করে বেড়াত বাখতিগ্নল — ছটফট করত যেন গরমের দিনে কুকুরের জিভ। এটা মেরামত, ওটা পরিষ্কার, এটা ঠেলা, ওটা টানা — কাজ খ্নঁজে বেড়াত বাখতিগ্নল, হয়রানি যেন জানত না। তার কাজের রোখ আর সাংসারিক ক্ষিপ্রতা দেখে তীব্র দৃষ্টি কাইরানবাই একেবারে গলে যেত — গাল ভরে হাসি ছড়াত যেন ফুটন্ত ভেড়ার চর্বিতে ঢেউ দিচ্ছে। লোকে পিঠ বেঁকিয়ে ঘাম ঝরাচ্ছে — কি মিঠেই না এ দৃশ্যটা।

'ওর হাতে কাজ চলে ঝাঁপিয়ে... সবেতেই ওস্তাদ... হিসেবেও আহাম্মক নয়... গ্ননতিতে কেউ ঠকাবে তা হতে দেবে না...' হাকিমকে বললে কাইরানবাই।

'বেচারী! অনাথ! সত্যিই আল্লার কোপেই ওর ধন নেই। নইলে অমন খাটিয়ে কিনা কাঙাল?' অন্যদের বলত সে।

জোতের যে কোনো কাজ — ঘোড়ার পাল চরাতে, ভেড়া খাওয়াতে, বসন্তের বীজ বুনতে, শরতের ফসল তুলতে — সবেতেই বাখতিগুল ওস্তাদ। গরু ঘোড়ায় খেয়ে ফেলে নি এমন মাঠ খুঁজে বার করতে হবে, 'জুট' থেকে, অর্থাৎ স্তেপের দুর্যোগ থেকে বাঁচিয়ে সময়মতো ছানি করে রাখতে হবে, পালে পার্বণে শাদা রুটি সেঁকতে হবে — সব কাজেই লাগত বাখতিগুল, সবই করত অন্য রাখাল, অন্য চাকরবাকরদের চেয়ে তাড়াতাড়ি, ভালো করে।

ছিল গোলাম, হল চাকর, তারপর হল উপদেষ্টা — শুধু হাকিমের বাড়ির লোকেরাই নয়, শুধু বাইগিন্নিই নয়, পাড়া প্রতিবেশী সকলেই আসত তার কাছে পরামর্শের জন্যে। কাজ কারবার নিয়ে, ঘর সংসারের ব্যাপার নিয়ে তার বুদ্ধি নিতে কেউ সংকোচ করতে না; মিটমাট করিয়ে দিত সে, সমঝে দিত, বয়সে বুড়ো না হলেও। ক্রমে ক্রমে লোকে তার নাম দিলে দূরদর্শী।

ধীরে ধীরে হাকিম তাকে টানতে লাগল নিজের কাছারির দিকে। আজ এ দায়িত্ব, কাল সে দায়িত্ব... বাখতিগুল ফের চেপে বসল ঘোড়ায়, কিন্তু লেঠেলের বল্লম নিয়ে নয়, কাঁধের ওপর থলি ঝুলিয়ে, সরকারী তকমা লাগিয়ে। নিজেকেই চিনতে পারছিল না বাখতিগুল।

এর মধ্যে নিজের কাজটাও ভোলে নি বাখতিগুল। কালি দিয়ে লেখা ছাপ-মারা জরুরী সব দলিল দস্তাবেজের থলি নিয়ে

ভলোস্তের এখানে ওখানে যাবার সময় সে ওইসঙ্গেই বিক্রির মতো কিছু মাল নিয়ে যেত, খদ্দের পেলে লাভে বিচত, আর কেনবার লোক ছিল অনেকেই, পথ চেয়ে থাকত কবে সে আসবে, কি জিনিস আনবে। বসন্তে বাখতিগুল নিজের জন্যে ক্ষেত চষলে, আকারে তার আগেরটার চেয়ে তিন-চার গুণ বড়ো, কিন্তু জারাসবাই তাকে কথাটিও বললে না, কাইরানবাই বীজ পর্যন্ত দিলে।

সালমেনের মতো এখানেও সে কোনো বেতন পেত না, কিন্তু জারাসবাই অন্তত সালমেন নয়, খেয়ে পরে থাকতে দিত তাকে। সামনের শীতের জন্যে হাতশা ঘরে জমালে মাংস, ময়দা, ঘি, শাদা নুন, ছেয়ে-হলদে দেশালাই — বাইদের বাড়িতে যেমন থাকে, আর জমালে শক্ত সুতো। নিজেও সে হাকিমের আউলে খাটত, কাজ করতে বাইগিন্নির, গ্রীষ্ম নাগাদ গায়েও বেশ মাংস লাগল তার, বলতে কি মোটা হয়েই উঠল। বাই বাড়ির পুরনো পোষাক আষাকই তার কাছে রাজসাজ, নিজের পুরনো জামা থেকে সে কেটেকুটে পোষাক করে দিলে ছেলেমেয়েদের — ন্যাংটা হয়ে ছেঁড়া কাপড়ে ঘুরত না তারা।

শীতকালেই জারাসবাই বাখতিগুলকে বলেছিল:

'ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে চাস? ওকে নিয়ে আসিস।'

এ একেবারে মহা আশীর্বাদ।

হাকিমের আউলে ছিল এক ছোকরা কাজাখ জুনুস। রুশী ইশকুলে লেখাপড়া শিখেছিল, বিদ্যের জন্যে লোকে তাকে বলত মোল্লা। ধনী পরিবারের দু-তিনটি ছেলেকে সে

পড়াত, হাকিমের ছেলে জানগাজিও পড়ত তার কাছে। কৃতার্থ হয়ে বাখতিগুল তার ছেলে সৈয়দকে নিয়ে গেল জুনুসের কাছে।

'ভলোস্তে যাবি, লেখাপড়া শিখবি, মানুষ হবি,' ছেলেকে বলেছিল বাখতিগুল, আশ্চর্য এ কথাটা সেই থেকে সৈয়দের মনে গেঁথে গিয়েছিল।

সারা শীত রুশী বর্ণমালা নিয়ে লাগল সৈয়দ, মুখস্থ করতে লাগল যাদু মন্ত্রের মতো সেই কথাগুলো যা তাকে মানুষ হতে সাহায্য করবে। শেখায় আগ্রহ ছিল তার, বাইয়ের আলসে, আদুরে-দুলাল মাথা-মোটা ছেলেটার চেয়ে সে চট করেই এগিয়ে গেল।

সৈয়দকে স্নেহ করে বলত মোল্লা:

'বড়ো হয়ে ওঠ, মোল্লা হবি।'

প্রায়ই রাতে বহুক্ষণ ঘুম হত না সৈয়দের, স্বপ্ন দেখত বড়ো হবে সে, মোল্লা হবে।

বাখতিগুলের খেতটা বেড়ে উঠল ঘন পরিপাটী হয়ে। ক্ষেতমজুরের মন ভরে উঠেছে শান্তিতে। গ্রীষ্মকালে সে পুরোপুরি সংসার তুলে চলে এল জারাসবাইয়ের আউলে, গণ্য হল তারই বংশের লোক হিসাবে। খুব গরমটার সময় সে ছেলেকে নিয়ে পাহাড়ের মাথায় চারণ মাঠে দিন কাটাত, তেষ্টা মিটিয়ে খেত হলদেটে ফেনায়িত 'কুমিস' — ঘোড়ার গ্যাঁজানো দুধ।

গ্রীষ্মে কাজের পরিমাণ কমে গেল। বাখতিগুলকে পুরোপুরি নিজের কাজে লাগল হাকিম। আর জারাসবাইয়ের

বেশির ভাগ কাজই কেমন রহস্যময় — তেমনি সব কাজের তাড়ায় দিন কাটল, এদিকে পেছনে রইল জারাসবাইয়ের আসল কাজটা।

কর্তার মর্জিটা চট করেই আয়ত্ত করে নিলে বাখতিগুল: যে সব আউলের প্রতি হাকিম সদয় সেখানে ভদ্রতা করে সৌজন্য দেখিয়ে চলা, আর যাদের প্রতি তাঁর তেমন কৃপাদৃষ্টি নেই সেখানে দাপট দেখানো, হুমকি ছাড়া। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো আউলের বৈঠকে হাকিম বক্তৃতা দিতে দিত বাখতিগুলকে — বলতে পারত সে ভালোই। প্রভুর প্রতি অনুরাগ এবং দক্ষতা দুই ছিল তার সমান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন অস্বস্তি বোধ হতে শুরু করল তার। লক্ষ্য করলে, আগে সে নিজে যেভাবে দেখত সালমেনের মোসায়েবদের, সেইভাবেই লোকে তাকে দেখে। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে এল।

সালমেন এতদিনও কিছু করে নি। প্রায় এক বছর কেটে গেল, জারাসবাই-ও সালমেনের কোনো কথা তুলত না। বাখতিগুল আন্দাজ করার চেষ্টা করত হাকিমের মনে কি আছে, এ নিয়ে যত ভাবত, ততই বুক ভার হত তার। এ শান্তিটা কপট, এ নীরবতা সন্দেহজনক।

নির্বাচনটা শরতে, কিন্তু বছরের গোড়া থেকেই চেলকার, বুর্গেন ও অন্যান্য ভলোস্তে শুরু হয়ে গেল নানা বংশের মধ্যে একটা ভয়ানক গোলমেলে দলাদলি। মাসে মাসে সেটা বেড়ে উঠতে লাগল, প্রকাশ্য হয়ে উঠল।

'এনার কাছে কোনো মঙ্গল নেই...' মনে মনে স্থির করলে দূরদর্শী বাখতিগুল, কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেল না কোন পথে সর্বনাশ আসবে।

যে উত্তেজনা জ্বলে উঠল সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, ভলোস্তের সীমা বহুদিন ছাড়িয়ে তা ছড়িয়ে পড়ল প্রকাণ্ড উয়েজদটার অর্ধেকটায়। সবচেয়ে তাতে গা ভাসালে ধনী বংশগুলো, ভলোস্তের কাজী আর আতকামিনেররা, মীমাংসাহীন সব কোঁদল বাধিয়ে নিজেদের পুরনো রাগের শোধ তুলতে চাইল।

দুর্বলেরা চাইলে রক্ষক, সবলেরা চাইলে সহযোগী। নির্বাচন যত কাছিয়ে এল, ততই পরিষ্কার হয়ে উঠল দুটি বৃহৎ প্রতিপক্ষ দল — একটির মাথায় চেলকার ভলোস্ত হাকিম জারাসবাই, অন্যটির নেতা বুর্গেনের সর্বেসর্বা, সালমেনের ভাই সাত, দুজনেরই গোপন দালাল ছিল প্রতিপক্ষের শিবিরে।

নিজের ভলোস্তে সাতের প্রতাপ চেলকারে জারাসবাইয়ের চেয়ে বোধ হল বেশিই। সাতের পক্ষে ছিল জনবহুল এককাট্টা কজিবাক বংশ। জারাসবাইয়ের পক্ষ নিল দু-তিনটি বংশ, ধনী বংশ, প্রভাবও আছে, কিন্তু স্তেপে এমন দুই বংশ কোথায়, যাদের নিজেদের মধ্যে খটাখটি নেই? তবে আত্মবিশ্বাসী সাত এবং অন্য সমস্ত ভলোস্ত হাকিমের চেয়ে উয়েজদে সেয়ানা জারাসবাইয়ের যোগসাজশ সূত্রসম্পর্ক বেশি। ক্ষমতার লাগাম সে ধরেই রেখেছিল।

সংঘর্ষ জ্বলে উঠল ঠিক রুক্ষ গ্রীষ্মে স্তেপের দাবানলের মতো।

রুশী রাজপুরুষ, ঝকঝকে বোতামওয়ালা উয়েজদ-কর্তা সর্বশক্তিমান রুশী সায়েবের উয়েজদ দপ্তরে চলল ধূর্ত সব নালিশ, অসংখ্য সই আর কাজী আর আতকামিনেরদের বংশগত মোহর ছাপ দেওয়া দলিল দস্তাবেজ।

সাতের আতকামিনেররা জারাসবাইয়ের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার নালিশে হাত পাকিয়েছিল। প্রতিটি নালিশেই ফল দেওয়ার কথা, অপমানকর মোটা জরিমানা হওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিবারই শহর থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে মাথা উঁচু করে ফিরত জারাসবাই। তারপর হঠাৎ সাতই জব্দ হল বেদম। জারাসবাইয়ের নালিশে সাতকে উয়েজদের হাজতখানায় পনের দিন কাটাতে হল। আল্লাই জানেন, কত চালাকি তার জন্যে খাটাতে হয়েছে জারাসবাইকে, কত টাকা ঢালতে হয়েছে, তবে যতই লাগুক ব্যাপারটায় কাজ দিয়েছে ঠিকই।

সর্বত্রই বলাবলি হল:

'নিজে ফিরল একেবারে ঘোড়ার কপালের শাদা টিপটির মতো, আর ওটাকে কোদাল খোঁচা করে মাথা গুঁজে দিয়েছে গোবরে, পনের দিন, পনের রাত, ওরে বাবা!'

এই সাফল্যটার পরে জারাসবাইয়ের বন্ধু জুটল বেশি, তেমনি জুটল শত্রু। যেখানে যত দাপট সেখানে তত হিংসে।

এক দণ্ড বিশ্রাম না নিয়ে আতকামিনেররা ঘুরতে লাগল ছাউনিতে ছাউনিতে, কোথাও হাত ধরাধরি, কোথাও হুমকি

দামকি। আইচাই গরম কাল, তবে কুমিস খাবারও সময় নেই। কেবল নির্বাচন, নির্বাচন... তিন বছরের জন্যে হাকিমি!

সাতের দলের ফাঁকফুক খুঁজে বেড়াল জারাসবাই প্রাণপণে। যারা অসন্তুষ্ট, প্রতারিত, দ্বিধাগ্রস্ত, এবং নিতান্তই যারা বিভ্রান্ত তাদের সবাইকে সে জোটাতে লাগল নিজের চারপাশে, বকশিস দিলে দুহাতে, ডাইনে বায়ে ছড়াতে লাগল টাকাপয়সা, ঘোড়া ভেড়া। সে জানত, সাতও তাই করবে, তাই নিজের লোকেদের ওপর কড়া নজর রাখলে সে, সন্দেহজনকদের তোয়াজ করলে, টাকা দিলে সাতের চেয়ে বেশি। তিন বছরের হাকিমি। সুদে আসলে সবই উঠে আসবে।

দিন এগুতে লাগল, ঠিক বোঝা গেল না কার পক্ষে ভার বেশি। নিজেদের কজিবাকদের নিয়ে সন্দেহ ছিল না সাতের, এরা জাঁক করত, ঠাট্টা করত জারাসবাইয়ের অত ঝামেলা-দুর্ভাবনা, অত টাকা ঢালা দেখে।

কজিবাকরা বলত, ‘সদরে ও ঈগল, কিন্তু ভলোস্তে চড়ুই। চেলকার-ওয়ালাদের তেল বার করে ছাড়ব...’ আর বাখতিগুল বেশ টের পেত কী এর পরিণতি দাঁড়াবে।

জারাসবাইয়ের ঘোড়ার পাল পাহাড়ে মাঠে চরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় একদিন হুড়োহুড়ির মধ্যে দেখা গেল তিনটে মাদী ঘোড়া আর একটি পুরুষ্টু বাচ্চা নেই। খোঁজাখুঁজি করতেই চোরের হদিশ মিলল। বিশ্বাসী একজন লোক, বুর্গেনের একজন চর খবর দিলে ঘোড়া হরণ করেছে সাতের হুকুমে সালমেনের লোকেরা। লুঠেরাদের পেছু পেছুই হাজির হল জারাসবাইয়ের লোকেরা। ঘোড়া ফেরত দেবার দাবি করলে,

কিন্তু এতটুকু চক্ষুলজ্জাও হল না সালমেনের, কদর্য গালাগালি করে, দুয়ো দিয়ে তাদের ভাগিয়ে দিলে আউল থেকে।

রাগে সে রাত জারাসবাইয়ের ঘুম হল না। ভোর হতেই সার্সেনকে নালিশ লিখতে বললে, দলিলপত্র পাঠালে সদরে। বাখতিগুল ভেবেছিল হাকিম তাকেই যেতে বলবে, বাই যেন খেয়াল করলে না। অবাক হয়ে, ক্ষুব্ধ হয়েই ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খুললে বাখতিগুল। সারা সকাল বাইয়ের আট দড়ির সামিয়ানায় ভিড় জমতে লাগল লোকের, সেখান থেকে ভেসে আসছিল তাদের কোলাহল। তর্কাতর্কি গালমন্দ চোটপাট করছিল মুরুব্বিরা।

শাদা-দাড়ি মান্যগণ্য মুরুব্বিরা যখন দুপুরে গরমের দাপটে ইয়ুর্তার ছায়ায় ফিরে গিয়ে গা তাজা করা কুমিসের জন্যে হাত বাড়াচ্ছে, কেবল তখনই বাখতিগুলের ডাক পড়ল জারাসবাইয়ের কাছে। হাকিমের বাদামী দাগ-ভরা টকটকে লাল মুখটার দিকে চাইতেই কেমন একটা অশুভ আশংকা হল বাখতিগুলের। কর্তার ডান হাতের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাইদের মধ্যে সবচেয়ে ষণ্ডামর্ক কৃষ্ণবর্ণ জোয়ান কোকিশ — ভুরু কুঁচকে চাবুক দোলাচ্ছে সে।

বাখতিগুলকে ডেকে বসালে জারাসবাই, কুমিস ঢেলে দিলে তার জন্যে, পাতলা পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে এই বলে শুরু করলে যে আল্লার দোয়ায় বাখতিগুল গত এক বছর খারাপ কাটায় নি, পুরো এক বছর, সবাই তা জানে, সবাই দেখেছে। বাই তাকে গতর খাটা হীন কাজে লাগাতে দেয় নি,

আসল মরদের যে কাজ সেই কাজের জন্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাখতিগ্নল টের পেল এবার তার এই অদ্ভুত অনভ্যস্ত শান্তির জীবনটা, আলসেমির জীবনটা শেষ হতে চলেছে।

'লাঠি না খাওয়া পর্যন্ত এই নেড়ী শেয়ালগ্নলো লেজ গ্নটবে না দেখছি...' যোগ করলে জারাসবাই।

থ্নতু ফেললে কোকিশ, সপাং করে চাব্নক মারলে নিজের ব্নটজ্নতোর ওপর। বাখতিগ্ললের হাতটা কে'পে উঠল, ছলকে পড়ল কুমিস। বাখতিগ্নল টের পেল: সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপারটাই ঘটেছে — চিরকেলে অভিশাপটা তার ফিরে এসেছে আবার।

'চুপ করে থাকলে কপালে হার,' বললে হাকিম। 'বসে বসে হাই তুলব আর ওরা ওদিকে বল্লম মারবে গর্দানে, ফাঁসে বে'ধে টেনে নিয়ে যাবে আমাদের ঘোড়াগ্নলো। লোককে মারধর করবে, ঘোড়া হরণ করবে। নিজেদের লোকেরাই কানাকড়িতে বিকিয়ে দেবে আমাদের... বছর ধরে যার অপেক্ষায় ছিলাম, বাখতিগ্নল, সেই দিন দেখছি এল এবার।'

বাখতিগ্নল চুপ করে রইল।

'নিজের পছন্দমতো জন দশেক ভালোমতো সওয়ারী বেছে নিয়ে যা এক্ষ্নণি, পাড়ি দে! সালমেন কি সাতের পাল না পেলে কজিবাক বংশের আর যার পালই হোক না কেন ছাড়বি না। তেজী, ভালো জাতের ঘোড়া ঘ্নড়ি দলকে দল হাঁকিয়ে নিয়ে আসবি। নজর আছে তোর... এই তো আর প্রথম নয়...'

এবারেও চুপ করে রইল বাখতিগ্নুল। কুমিসের পেয়ালাটা শেষ না হলেও রেখে দিল সে, হাত ম্নুছলে আলখাল্লাতে। মনে হল গলায় যেন দলা পাকিয়ে গেছে। 'বছর ধরে যার জন্যে অপেক্ষা…' তার মানে কি? এই সেদিন না ঘরের পোষা জানোয়ারটার মতো বাই আর আতকামিনেরদের কাছে জারাসবাই বাখতিগ্নুলকে দেখিয়েছে, আর তারা গ্নুণগান করেছে বাইয়ের, নফরের পিঠ চাপড়ে উপদেশ দিয়েছে সৎ পথে চলো! কতদিন আগের কথা এসব? এতো কালকের ঘটনা, আর আজই যা 'পাড়ি দে!' কি বলবে লোকে? কি সে বলবে তার নিজের ছেলে সৈয়দকে?

বাখতিগ্নুলের সামনে উঁচু হয়ে বসলে কোকিশ, ষাঁড়ের মতো গর্দান ফুলিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

'কি রে তুই, বাই-ঘরের র্নুটি খেয়ে খেয়ে মাগী বনে গেছিস। এমন কাজে মরা মান্নুষও যে লাফিয়ে ওঠে!'

বাখতিগ্নুল কিন্তু হাসল না। কুমিস ঢেলে দিয়ে জারাসবাই বললে, 'সাতই প্রথম বাধিয়েছে, তুইও জানিস, সবাই জানে। ও শ্নুর্নু না করলে এ ঝগড়া বাধত না। নিশি রাতে চুরি করে ওরা হাত নোংরা করেছে। আমরা খাঁটি 'বারিমতায়' ম্নুখ ধোব! চোরগ্নুলো এখন যেখানেই ল্নুকোক, খোদ লাটসায়েবের শরণ নিলেও সবাই আমাদের পক্ষই নেবে। কাজাখ র্নুশী সবাই… ব্নুঝলি কথাটা?'

'না হ্নুজ্নুর, ব্নুঝলাম না। মাথায় আমার গোলমাল হয়ে গেছে,' ভাঙ্গা গলায় মনমরার মতো বললে বাখতিগ্নুল, 'শ্নুধ্নু

একটা কথা জানি: নাকের ডগায় শরৎ, আর এ শরতে চোরই হোক আর বারিমতাওয়ালা হোক সবারই এক দশা, আসমান জমীনের মাঝখানে ফাঁসিতে ঝোলা সওয়ারী... অনেক কষ্ট সয়েছি আমি। মিনতি করি, হুজুর, আমায় পাঠিও না!'

জারাসবাই বিরক্তি ভরে থামিয়ে দিল ওকে, 'কবে থেকে দড়িতে ঝোলা সওয়ারী দেখতে শুরু করেছিস? ইস, খুব যে দূরদর্শী হয়েছিস!.. নিজের কর্তব্য ভুলে গেছিস? পিতৃপুরুষদের কথা মনে নেই? সাত তোর বাপের সর্বনাশ করেছে। সালমেন তোকে অনাথ বানিয়েছে। সাত আর সালমেনের বিরুদ্ধে আমি তোর সহায়। এ সুযোগ যদি ছাড়িস, তবে তুই একটা কাপুরুষ, বেইমান, বে-মগজ, বে-হাত একটা অকম্মা, খামোকা তোকে খাওয়ালাম!'

'কি আমায় করতে বলছ কর্তা, ভেবে দেখ?' দমে গিয়ে বললে বাখতিগুল, 'ছেলে আমার কি শিক্ষা পাবে?'

আস্তে করে হাসল জারাসবাই।

'জবাবদিহি যা করবার সবই আমার। এ দুনিয়ায় বটে, ও দুনিয়াতেও বটে। আমি খাওয়াই, আমার হুকুম। আমার হুকুম, আমার পাপ, আমার গুনাহ! চলে যা, খোদা হাফিজ...'

'হয়েছে, হয়েছে, অত আর বোঝাতে হবে না,' যোগ দিলে কোকিশ, 'ভাবনা নেই, ও যাবে।'

জারাসবাই কষ্ট করে গা তুলল।

বাইয়ের আগেই চট করে লাফিয়ে উঠতে গিয়েও বাখতিগুল নিথর, বধির হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে রইল।

৬

সেই দিনই জারাসবাই, সার্সেন আর কোকিশের পাল থেকে দশটি সেরা সেরা ঘোড়া বাছা হল, লম্বা লম্বা লেজ, বাতাসের মতো বেগ। বাখতিগুলের নেতৃত্বে তৈরি হল দশ জোয়ান। চুপিসারের কোনো ব্যাপারই ছিল না কেননা এটা একটা সত্যিকারের বারিমতা। সন্ধ্যায় আউলের ছোটো বড়ো সবাই বেরিয়ে এল জোয়ানদের বিদায় জানাতে।

জিগিতদের বেশভূষা সামান্যই, ছেয়ে রঙের চেকপেন — উটের লোমের আলখাল্লা। কিন্তু মরদের শোভা তো বেশে নয়, গায়ের জোরে, তেজী ঘোড়ায়। দলটা বেশ জোয়ানেরই দল। পেশল ঘাড়ের ওপর আঁট হয়ে বসেছে চেকপেন, ঘুষি মেরে পাথর গুঁড়োয়, বাতাসের বেগে ছোটে, উড়ন্ত চিলের মতো ক্ষিপ্র। বেয়াড়া রসিকতা করে ফাজলামি করছে নিজেদের মধ্যে, মনে হয় যেন খুবই মজাদার একটা খেলায় নেমেছে তারা, নিজেদের আর নিজেদের ঘোড়াগুলোকে দেখিয়ে জাঁক নিচ্ছে আউলের লোকেদের সামনে। সে ঘোড়া দেখবার মতো। পিঠের ওপর নিচু চ্যাপটা জিন, লেজ খাটো করে বাঁধা, সগর্বে চিকন মাথা তুলছে তারা, সরু সরু পায়ের ওপর ছটফট করছে। নাম করা দৌড়বাজ সব, প্রতিযোগিতায় পয়লা। গোধূলির নরম আলোয় জরির কাপড়ের মতো ঝলমল করছে তাদের গায়ের চিকন লোম। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, ঘুরপাক খাচ্ছে সওয়ারীকে নিয়ে। আউল জুড়ে শোনা যাচ্ছে হালকা খুরের ধুপধুপ শব্দ, ঠিক যেন লড়াইয়ের দামামা বাজছে।

সবাই অপেক্ষা করেছিল বাখতিগুলের জন্যে। বেরল সে বড়ো ইয়ুর্তা থেকে, একেবারে চেনা যায় না। তার পোষাকও সাধারণ, বিশেষ চোখে পড়ার মতো নয়, এটা ভালো লাগল সবার। কিন্তু ভাবে ভঙ্গিতে কি যেন একটা নতুন, যা আগে দেখা যায় নি। চেকপেন পরেছে শুধু বাঁ কাঁধে, ডান আস্তিনটা কোমরবন্ধে গোঁজা, অবাধে কাঁধ নড়ানো যাবে এতে, হাত চালানো যাবে। কোমরবন্ধে ছয়ঘরী রিভলভার। সে রিভলভার দিয়ে বাখতিগুল অবশ্য গুলি করবে না, এটা হল কে সর্দার তারই চিহ্ন, ওইটে দেখেই বোঝা যায় কে প্রথম ঘা মারবে, প্রথম ঘা খাবে, তারই মতো পালোয়ানদের হানা সইবে প্রথম।

তাড়াহুড়ো না করে গম্ভীর চালে বাখতিগুল এগিয়ে গেল দলের দিকে, চোখ তাদের আর নড়ে না। এমন লোক সঙ্গে থাকলে বিপদের ভয় নেই। অন্য সকলের চেয়ে দেহটা তার মজবুত, ভরাট। ডান হাতের কব্জি থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঢেউ খেলা পেশীতে ঝলক দিচ্ছে স্প্রিঙের মতো উদ্দাম শক্তি।

মুখটাও বাখতিগুলের যেন সে মুখ নয়। কোঁচকানো, নরুনচেরা ধারালো চোখে ঝলক দিচ্ছে অধীর লোলুপ একটা আবেগ। শুধু খোঁচা খোঁচা মোচের পাশেই কেমন একটা অপ্রত্যাশিত নরম হাসি — কেমন যেন স্বপ্নাতুর।

'চলো হে ঈগলের দল!' আচমকা জমকালো গলায় হাঁক দিল সে, 'খোদা হাফিজ!' চারিদিকের স্তব্ধতার মধ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাপিয়ে গলাটা তার গমগম করে উঠল।

'খোদা হাফিজ!' সমস্বরে জবাব দিলে জিগিতরা।

'খোদা হাফিজ!' যোগ দিলে সমবেতরা।

টান টান ফাঁসের দড়িটা দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল ঘোড়াটাকে। বাখতিগুল সেদিকে এগুবার আগেই ছোকরা মতো একজন সহিস সামনে টেনে নিয়ে এল একটি দীর্ঘাকৃতি লালচে বাদামী ঘোড়া, লেজটা টান করে বাঁধা। সূর্যাস্তের রক্তিম আভায় তাকে দেখাল যেন মস্ত এক অগ্নিকুণ্ডের আগুনের মতো। এ ঘোড়া হাকিমের পেয়ারের ঘোড়া, জারাসবাই সেটা ব্যবহার করে 'বাইগা'র জন্যে, স্তেপের বুকে বহু ভার্স্ট লম্বা পাড়ির সময়।

সর্দারকে সম্মান করে ঘোড়ায় চাপাতে চেয়েছিল সহিস কিন্তু বাখতিগুল লাগামের প্রান্তটা কোমরে গুঁজে রেকাবে প্রায় পা না দিয়েই লাফিয়ে উঠল জিনের ওপর, ঘোড়াটা পাশকে ভঙ্গিতে সওয়ারীকে নিয়ে পাঁচ পা সরে দাঁড়াল।

'চলো এবার,' ঘোড়ার গায়ে খোঁচা দিয়ে আদেশ দিলে বাখতিগুল।

সওয়ারীরা ঘেঁসাঘেঁসি করে ছুটল তার পেছন পেছন, ছুটতে ছুটতেই বর্শা আর ডাণ্ডা, 'সইল' আর 'শকপার' গুছিয়ে রাখলে জিনের সঙ্গে। কেউ কেউ আবার অবহেলায় লাঠি নিল বগলদাবা করে। যেন মারপিটে নয়, বেড়াতে বেরিয়েছে।

আউলের মেয়ে পুরুষ ছেলেপিলেরা ভীড় করে ছুটল তাদের পেছন পেছন, হাঁক দিলে, চেঁচালে, বাহবা দিলে। মরদের দল, বেপরোয়ার দল চলল স্তেপে! উদ্দাম হয়ে উঠবে তারা, দৈত্য দানো সামনে পড়লেও দলে পিষে যাবে...

আবছা অন্ধকারে ঝাপসা ঝলক দিচ্ছিল ঘোড়ার গায়ের উজ্জ্বল রঙ, ক্রমশ তা গাঢ় একটা ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল,

তাহলেও বহুক্ষণ ধরে শোনা যেতে থাকল উন্দাম কদমের তরঙ্গায়িত ধ্বনি।

এইভাবেই শুরু হল বারিমতা, — মামুলী লোক, সেয়ানা লোক সবাই বলে এটা ধর্মযুদ্ধ, ন্যায্য বারিমতা। বাইয়েরা মেটায় তাদের সাবেকী দম্ভ, গরিবেরা মেটায় তাদের যুগযুগের স্বাধীনতার আবেগ। কারো মাথায় পড়ে ডান্ডা, কারো জোটে মুফতে ঘোড়া। যার কপালে যা লেখা — সব হাকিমের বড়ো হাকিম তাঁর যা মর্জি।

ভোরের দিকে বাখ্‌তিগুল আর তার ঈগলেরা কাজ হাসিল করলে, ছোটো একটা পাল হাঁকিয়ে নিলে সাতের, গোটাদশেক জোয়ান ঘুড়ি আর ঘোড়া, ঘাড়ে তার কেশর দেখা দিয়েছে। খুব অনায়াসেই ঘটল ব্যাপারটা, যদিও পেছনে গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল। তিন ভলোস্তের সীমানায় জনমানবহীন, নিস্তব্ধ পাহাড়ের কোলে তারা গা ঢাকা দিলে অক্ষত দেহেই।

যাবার পথে অচেনা একটা আউল থেকে বছর-বয়সী ভেড়ার ছানাও একটা হরণ করা হল, পেছনে কুকুরের ডাক ছাড়া আর কিছু ঘটল না। পাথরের মাঝখানে বেপরোয়ার মতো আগুন জ্বালানো হল। মাংস রান্নার হুকুম দিয়ে বাখ্‌তিগুল গেল নুড়ি ছড়ানো ন্যাড়া পাহাড়টার মাথায়।

সামনে প্রসারিত হয়ে আছে একটা কঠিন, ইঁটের মতো লাল, প্রায় রক্তমাখা শিলাস্তূপ। তার ওপারে বনশুয়োরের কুচির মতো খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে ফার গাছ। পোড়া কাঠের মতো কুচকুচ করছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফার, তার ওপর ঝিলমিল করছে নীলাভ ধোঁয়াটে মরীচিকা। তারও ওপরে ঝিকমিক

করছে বরফ ঢাকা গোলালো চুড়ো, যেন এক খানদানী শাদা ইয়ুর্তা, রাতের অন্ধকারে উঠিয়ে নিয়ে এসেছে সূর্য। অতল আকাশে পাখা মেলেছে ঈগল, দেখাচ্ছে ঠিক যেন চড়ুই।

ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল বাখতিগুল, লাল শিলাটার দিকে, কালো বন আর শাদা বরফের ইয়ুর্তার দিকে, উড়ন্ত ঈগলটার দিকে, বুকের মধ্যে তার ভার-ভার ঠেকল। দেখে দেখে সে ভাবছিল, 'যা ছেড়ে এলাম সে কাজেই ফিরতে হল, এই আমার নসীব!'

নিচের অগ্নিকুন্ড থেকে স্বচ্ছ ধোঁয়া উঠছিল, রান্না মাংসের গন্ধ ছাড়ছে, জিগিতরা কলরব করছে মেয়েদের মতো, হুটোপুটি করছে যেন বাচ্চার দল, পায়ের তলে খড়মড় করে উঠছে ছড়ানো নুড়িপাথর। শক্ত মোচের ডগাটা কামড়ে ভ্রূকুটি করলে বাখতিগুল।

নৈশ অভিযানের উত্তেজনা মিলিয়ে গেছে নেশার আমেজের মতো। বুকের মধ্যে রয়ে গেছে শুধু একটা তিক্ত ঝাঁঝ।

'যাক গে — কী আর হবে বারি-বির!' শব্দ করেই বলে উঠল বাখতিগুল।

যশ হবে তার, নাকি অপযশ হবে, কে জানে। ভাগ্য তার জারাসবাইয়ের হাতে। তার হাতেই শাস্তি, তার হাতেই কৃপা। খোদা শুক্‌র্‌, যতই হোক এ লোকটা সালমেনের মতো নয়। মনপ্রাণ দিয়ে তুই খেটেছিস, এটা জারাসবাই ভুলবে না।

'তা সেই বা আমাদের কম কি বেটা,' ফিসফিস করলে বাখতিগুল, 'ওতেই তুষ্ট থাকি...' নুড়ির ওপর দিয়ে সে ফিরে এল অগ্নিকুন্ডের কাছে।

এইভাবেই শুরু হয়ে গেল বারিমতা। সেদিনকার সেই সফল রাতটা থেকেই বংশে বংশে এমন দলাদলি শুরু হয়ে গেল যা আর আগে কখনো দেখা যায় নি। রাতের আঁধারে, দিনের আলোয়, স্তেপের মাঠে, পাহাড়ের বুকে বেধে উঠল ক্ষিপ্ত মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা, উন্মত্ত চিৎকার উঠল তাড়ার, রক্ত বইল, আগুনের কালি উঠল আকাশের বুকে। আর বীরোচিত রণকোলাহলের পেছন পেছন আগের মতোই চলল গোপন অপহরণ, আউলে আউলে, মাঠে মাঠে ছড়াল চুরি। কোনটা খাঁটি বারিমতা আর কোনটা চুরি, কোনটা দিনের আলোয় লুট, কোনটা মাঝরাতের পাপ — এ বিচার করে বলার সাধ্যি রইল না কোনো নবীর, কোনো পয়গম্বরের।

সত্যি বলতে, স্তেপ এলাকার নির্বাচন ঠিক 'জুতের' মতোই — কেউ জানে না, স্তেপের শীতকালের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই জুত কখন এসে আছড়ে পড়বে। অথচ প্রতি তিন বছর পর পরই নির্বাচন! মনে হল, জারাসবাই যেন স্থির করেছে হয় জয় নয় ধ্বংস।

আগের মতোই এমন দিন যায় না যেদিন সেখানে জমায়েৎ না জোটে, নানা রকম হট্টগোলে সলাপরামর্শের বৈঠক না বসে, অতিথি না আসে... গোণা নেই গুণতি নেই, ছুরির তলে জবাই হল পশু — অতিথিদের জন্যে, ফাঁসে বাঁধা হয়ে যাত্রা করলে ভেট হিসাবে। আর বাইয়ের আস্তিনের তল থেকে কত যে টাকা খসল কে বলবে! জারাসবাইয়ের যে সম্পদ ছিল বসন্তে তার তেভাগার এক ভাগই খরচ হয়ে গেল মাস দুয়েকের মধ্যেই। এবার সে বাখতিগুল আর তার জিগিতদের জিরবারও সময়

দিল না। সালমেনও এক সময় তাই করত তাকে নিয়ে, কিন্তু জারাসবাই সেয়ানা, বললে লুটে পাঠাচ্ছে খরচা তোলার জন্যে নয়, প্রতিহিংসার জন্যে। সত্যি, বলে ভালোই!

অবাক হবার কিছু নেই, সেয়ানাটা খুব একটা কাজ হাসিল করলে, সাতের একজন বড়ো দরের সহায়কে জোটালে নিজের পক্ষে। হঠাৎ জারাসবাইয়ের বন্ধুত্ব হয়ে গেল বুর্গেন ভলোস্তের দোসাইদের আউলের সঙ্গে। চেনা ভুঁড়িমোটাদের দুর্দান্ত আউল এটা — উদ্ধত কজিবাকদের এরা ঠিক সইতে পারছিল না। এর জন্যে মোটা খরচপত্রও বাদ গেল না।

কাজী, মোল্লা, মুরুব্বি লোকেরা, স্তেপ এলাকার রাজনীতি যারা অনেক দেখেছে, তারা বলত, পানির ধারা ঘাসে মেশে, শত্রু মেটায় কন্যে এসে... হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, বিয়ের যুগ্যি কন্যে! দোসাই বংশের কর্তার ঘরে ছিল শ্যামলা রঙের তরুণী মেয়ে কালিশ, জারাসবাই ঘটক পাঠালে।

বাখতিগুল বেশ বুঝলে ব্যাপারখানা কী। জারাসবাই মেয়ের রূপ দেখে ভুলেছে, পেয়ারের বাইগিন্নির সঙ্গে ঘরে এনে তুলতে চায় তরুণী সতীনকে, এমন কাণ্ড না হতে পারে তা নয়। কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। কথা হল, জারাসবাই যে তার সেরা সেরা পঞ্চাশটি উট বাছাই করে পাঠালে কন্যের বাপের কাছে। এমন কালিম, এমন পণ কে কবে শুনেছে, যেন বিয়ে করছে খাঁয়ের কন্যে। তার ওপর মা-বাপের জন্যে প্রাথমিক ভেট সেলামী তো আছেই।

সন্দেহ নেই বৈবাহিক সম্বন্ধটাই সবচেয়ে সেরা সম্বন্ধ, এতে বংশে বংশে বাঁধন পড়ে, রক্ত শপথের চেয়েও তা

কড়া। বর কনেুর দুই আউল চিরকালের মতো অঙ্গে অঙ্গে জোড়া পড়ল। বসে বসে হাত কামড়াতে লাগল সাত, দোসাইদের আউল তার পথ জুড়ে বসল ঠিক সাকসাউলের কাঁটা গাছের মতো, চেপে পেরনো যায় না, ঘুরে এড়ানো যায় না।

স্তেপ ওদিকে অসুখে পড়া মেয়ের মতো কোঁকাতে লাগল। আজ এখানে কাল ওখানে বারিমতার খপ্পড়ে পড়ল লোকে, অকারণে ভুগতে লাগল নির্দোষীরা গরিবেরা, সাত জারাসবাই — কাউকে নিয়েই যাদের গরজ নেই। অঝোরে ঝরল চোখের জল, গালমন্দ অভিশাপ!

সবকিছুরই বেশ পাকা বন্দোবস্ত করলে জারাসবাই। লুট করে আনা পশুপাল সে পাচার করে দিত নিজের উয়েজদ বা পাশের উয়েজদে, একেবারে খাঁটি ব্যবসায়ীর চালে। হাঁকিয়ে নিয়ে আসত বাখতিগুল, আর হাঁকিয়ে পাঠাত কাইরানবাই... এ আনত, ও ছাড়ত, অর্ধেক দামে, কোনো রকমে হাত খালি করতে পারলেই যেন বাঁচে। চালাতও খাসা! সালমেনের ফড়ে পাইকাররা কখনো তা পেরে উঠত না। দলে দলে এসে জমত পশু — রাতে আসত, সকালেই নেই। জারাসবাইয়ের টাকার থলিতে টান পড়ল না।

সবকিছু চুলোয় দিলে বাখতিগুল। দিন কাটাত ঠিক যেন এক রক্তমাখা উত্তপ্ত কুয়াসায়, ঠিক যেন স্তেপের ধুলোটে ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে, যখন দিনের বেলাতেও নজর চলে না। লুট করে আনা পালগুলো কোথায় যাচ্ছে, তা সে দেখত না। জারাসবাই নজর রেখেছিল যাতে এ নিয়ে সর্দারকে দুশ্চিন্তা

করতে না হয়। সার্সেন, কাইরানবাই আর কোকিশকে কড়া করে হুকুম দিয়ে রেখেছিল:

'তোমাদের কাজকর্মের সময় ও যেন ঘুমিয়ে থাকে!.. দূরদর্শী যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে, কি কোথায় গেল, কি ব্যাপার।'

কাছিয়ে এল নির্বাচন। জয় হল জারাসবাইয়ের, চেলকারের হাকিম পদ তার বহাল রইল। হার হল সাতের, ভোট পেল না সে। দোসাইদের আউল অবশ্য বুর্গেনে তাদের প্রার্থীকে টেনে আনে নি, তা সত্যি। কিন্তু কজিবাকরা পারল না। খামোকাই অত টাকা ঢালে নি জারাসবাই। নিজের ভলোস্তে তথা উয়েজদে ক্ষমতার সোনালী ভেড়াটির লোমশ পশম ছাঁটার পালা এল তার।

সঙ্গে সঙ্গেই সে বাখতিগুলকে ডেকে পাঠালে, আদাব নেওয়ার পর দরাজ মেজাজে পিঠ চাপড়িয়ে ঘরে পাঠালে:

'যা এবার, ঘুম পুষিয়ে নিগে। বৌ ছেলের খুশ হোক। পুরো তিন বছর তোর ছুটি, পরের নির্বাচন পর্যন্ত...'

প্রকাশ্যেই হাঁপ ছেড়ে বুক হালকা করল বাখতিগুল। কর্তার চোখের সামনে থেকে যত তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে সে বাঁচে, কর্তাও বাঁচে যত তাড়াতাড়ি সে দূর হয়।

'হুজুরের ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা,' নফর বললে ভদ্রতা করে।

'যা, যা, সে পরে দেখা যাবে...' অবহেলায় জবাব দিলে ক্ষমতাধর বাই।

৭

শরতের দুর্দিন এল। নিজের শীতের ভিটেয় উঠে গেল বাখতিগুল, সঙ্গে নিয়ে গেল ছেলেকে। ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে রওনা দিলে। নিতান্ত মাঝে মধ্যেই সে দেখা দিত হাকিমের আউলে, কর্তাকে যথাযোগ্য সম্মান জানাত, আদাব জানাত; দিন দুয়েক আতিথ্য নিত, তারপর হালকা মনে ফিরে যেত নিজের ঘরে, সংসারের ভালোবাসার মধ্যে। এ সময় আউলে তাকে মনে হত পর-পর, জোত জমি কি কাছারির কাজ, কিছুই করত না, কোনটাতেই তার মন বসত না। থাকত নিজের মনে, লোকের আলাপে যোগ দিত না, গালগুজবে কান দিত না। সেইজন্যই কিছুই জানত না কি হচ্ছে দীন দুনিয়ায়, অর্থাৎ কি চলছে হাকিমের দলের ভেতরে। শুধু একটা কথা সে মনে রেখেছিল, দুষমন তাদের একই — কজিবাকরা। শুধু এইটেই সে মনে গেঁথে রেখেছিল ভালো করে, আর কিছু নিয়ে তার মাথা ব্যথা ছিল না।

তাই যেদিন হঠাৎ ঘোড়ায় চেপে ছুটে এল জিগিত, ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে হাঁক দিয়ে বললে, 'জারাসবাই তোকে ডেকেছে!..' বাখতিগুল সেদিন বিশেষ দুর্ভাবনা বোধ করে নি, পেয়াদার পেছু পেছু রওনা দিলে।

আউলে জমায়েত হয়েছে ভলোস্তের সমস্ত হোমরা-চোমরারা — সেই সঙ্গে বাইরেরও কেউ কেউ। ঘোড়াগুলোকে চরতে ছেড়ে দিয়ে তারা বসেছে ভলোস্ত হাকিমকে ঘিরে।

অন্যদের থেকে একটু দূরে অরাজদের আউলের লোক চোখে পড়ল বাখতিগুলের। এরা বুর্গেন ভলোস্তের পড়শী।

বুর্গেনে অরাজ বংশ জারাসবাইয়ের কুটুম দোসাই বংশের চেয়ে কমজোরী, এবং কজিবাকদের চেয়ে অনেক দুর্বল, কিন্তু সবলেরা যখন পরস্পর কামড়াকামড়ি করছিল, সেই ফাঁকে অরাজ বংশের লোক এসে বসে ভলোস্ত হাকিম হয়ে। নির্বাচনের পর দেখা গেল যে বুর্গেন ভলোস্তের নতুন হাকিম পরাজিত সাতের পক্ষে কাজে লাগবে। এতো বোঝাই যায়, কমজোরী বংশের হাকিম তো আর স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে না, কজিবাকদের লাগাম মেনেই চলতে লাগল সে।

অরাজদের দেখেই ভাবল বাখতিগুল, ওদের নালিশেই ডাক পড়েছে নিশ্চয়। সত্যিই তাই। বারিমতার সময় তার জিগিতরা এদের ঘোড়াও হরণ করে, কেননা এরা বুর্গেনের লোক... তবে বাখতিগুলের ভুল হয়েছিল অন্য ব্যাপারে। জারাসবাই তাকে গ্রহণ করলে নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে। সেলামটা নিলে যেন অনিচ্ছা ভরে, প্রায় কষ্ট করে। আদাবের পর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার কথা। সে সবকিছু না করেই খুব কড়া একটা বক্তৃতা ঝাড়লে, যেন বাখতিগুল তার নিজের লোকেই নয়।

'ছিঃ বাখতিগুল... কাণ্ডজ্ঞান নেই তোর। চুরিচামারি করে বসলি! তোর কথায় বিশ্বাস করেছিলাম আমি, সবাইকে বলেছিলাম, ওসব নোংরা কাজে তুই আর নাক গলাবি না। আমি ওদিকে তোর জিম্মা নিচ্ছি, তুই এদিকে মুখে কালি

দিচ্ছিস আমার। এমন হেনস্থা করলি কেন বল দেখি! অন্তত জবাবটা দে...’

বাখতিগুলের সঙ্গে এমন সুরে আর কখনো কথা বলে নি জারাসবাই। মহৎ একটা রাগে ককিয়ে উঠছে হাকিম, সারা মুখ লাল। সত্যনিষ্ঠার ভান করে বাই নিজের মাথাটি বাঁচালে, কবুলতি দাবি করলে তার নফরের কাছে। স্তম্ভিত হয়ে শুনে গেল বাখতিগুল উপকারকের কাছে সে অপরাধী।

‘কিন্তু আমার দোষ কিসের হুজুর? একেবারেই রেগে আগুন হয়ে উঠলে বটে! শোনাবার মতো আর কোনো কথা পেলে না? আগে দেখাও দোষটা কোথায়, তারপর দয়ামায়া না করে শাস্তি দিও। কুকথা ভরা মিথ্যে নিন্দে শুনলে ক্ষোভ হয় গো। আগে যাচাই করো ঠিক করে জানো...’

‘অত জানাজানির কিছু নেই আমার! দেখেই বোঝা যাচ্ছে তুই, তুই ছাড়া আর কেউ নয়... এ তোর কাজ... সত্যি কথা কবুল কর — বুর্গেন ভলোস্তে অরাজদের আউল থেকে তুই একটা চকরা বকরা ঘোড়া, একটা বাদামী ঘোড়া আর দুটো দুধলো ঘুড়ী মেরেছিস কি না? মেরেছিস... তার শোধ দে!’ ভয়ংকর গলায় আদেশ দিলে হাকিম।

তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল বাখতিগুল। নেওয়ার কথা যা বলছ তা হয়ত নিয়েছি... যেটা সত্যি তা সত্যিই। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল না বাখতিগুল, চোখের ওপর মিথ্যা কথা বলতে চাইল না। কিন্তু অমন বোকা সাজছে কেন হাকিম। অরাজদের এ ঘোড়া চুরি করার হুকুম তো সেই দিয়েছে,

এখানকার অনেকেই তার সাক্ষী। কিন্তু তারাও বাখতিগুলের দিকে চেয়ে মুখ বুঁজে রইল।

নিজের সর্দার লেঠেলকে সত্যিই কি হাকিম পরিত্যাগ করবে? তা হতে পারে না!

এটা শুধু ওর লোক দেখানি... বাইরের লোকের কাছে ... চোখে ধুলো দেবার ফন্দি। কি করতে হবে, কি বলতে হবে সেটা বাই ভালোই বোঝে, এখনই তার সঙ্গে ঝগড়া করা, তার চালে বাদ সাধা উচিত নয়। বাইয়ের নিশানা যে অনেক দূরে, অনেক সূক্ষ্ম তার হিসেব।

'কি আর বলব, আগেও মিছে বলি নি, এখনো বলব না।' বললে দূরদর্শী বাখতিগুল, 'সবই তোমার হাতে হাকিম, আমাদের জান, আমাদের পেট সবই তোমার দয়ায়। তোমার কথায় বাধ সাধব, সেকি আমার সাজে? তুমি আমার একমাত্র হাকিম, আর তোমার বিচার করবেন খোদা! হ্যাঁ, ঘোড়া আমি নিয়েছি। যা মনে আছে হুকুম করো, তবে অরাজদের ক্ষতিপূরণটা যেন পুরো হয়। এর বেশি আমার বলার নেই।'

শাদা-দাড়ি কালো-দাড়ি সবাই যেন একমুহূর্তেই চাঙ্গা হয়ে উঠল, নড়ে চড়ে বসল, দাড়ি দোলালে, চোখ মটকালে, আঙুল তুলে হুমকি দিলে। বাখতিগুলের কথাটা পছন্দ হয়েছে সবার। ক্ষমতা আর বাধ্যতা — দুয়ের মধ্যে বড়ো টান।

ফের শোনা গেল হাকিমের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আর ন্যায়পরতার তারিফ। বাখতিগুলকে লক্ষ্য করে কে যেন মন্তব্য করলে:

'যেমন তেমন জান নয়, খাঁয়ের মতো মেজাজ! মরবে তবু মিথ্যা বলবে না।'

আর একজন বললে, 'মানুষ খুন করতে হয়, খুন করবে, কিন্তু মনিবের কাছে লুকবে না। নিয়ে থাকলে বলবে, হ্যাঁ নিয়েছি...' এটাও হাকিমের উদ্দেশেই তারিফ।

কর্তার আত্মতৃপ্তি দেখে বাখতিগুলেরও আনন্দ হয়েছিল সে সময়।

তবে একটা জিনিস সে বুঝতে পারছিল না। নজর করে সে দেখল ফরিয়াদী অরাজদের পাশে বসে আছে দোসাইদের আউলের লোক... সেটা আবার কি? নিজের চোখকে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সারা গ্রীষ্ম আপোসহীন শত্রুতা চলেছে এদের মধ্যে আর হঠাৎ একেবারে মিলমিশ হয়ে গেল ঠিক যেন এক বাসার পাখি, বসেছে একেবারে ঘেঁসাঘেঁসি করে, বসেছে হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে, দেখে বোঝাই যায় না যে এদের মধ্যে হাসিখুশি মিলমিশ নেই।

বিচার হচ্ছে নিজেদেরই একজন লোক, বাখতিগুলের। সরাসরি দোষ স্বীকার করেছে সে, এড়িয়ে যায় নি, তাহলেও কিন্তু হাকিমের গলার স্বর নরম হল না, মুখ কোমল হয়ে উঠল না। জারাসবাই এবার ধমক দিতে লাগল গলা ফাটিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত হুমকি দিলে।

'আমার কাছে ওসব প্রশ্রয় চলবে না! আমি তোকে আদর করে বুকে টেনে নিলাম, নিজের লোক বলে তোকে গণ্য করলাম, সেটা কিসের জন্যে শুনি? সততার জন্যে। এরপর

ফের যদি কখনো পিছস, সত্যের পথ থেকে এক পাও দূরে যাস, তবে সেই দিন থেকেই তুই আমার কেউ নস, তুই আমার পর। পা বাড়াবার আগে তিনবার ভাবিস...'

'এটা বড়োই বাড়াবাড়ি হচ্ছে!' ভাবলে বাখতিগুল কিন্তু চুপ করে রইল।

চুপ করে গেল অন্যেরাও, হাকিমের গলার স্বরে যেন স্তব্ধ বাধ্য হয়ে উঠল সবাই, সে স্বরের রোষকষায়িত সম্ভ্রান্ত ধ্বনিতে, তার জলদ-গম্ভীর গুরুগুরুতে। অতি সুন্দর কণ্ঠস্বর হাকিমের, খোদার দান, হকদার ইমানদার মানুষের ঠিক এমনটাই হওয়া উচিত।

অরাজদের মোড়লের দিকে দেখালে বাই।

'তুই যে পালটা ভাগিয়ে এসেছিস তার মালিক এই লোকটি এখন তোর সঙ্গে যাবে। তুই তাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাবি, নিজের হাতে চারটে সরেস ঘোড়া তুলে দিবি এর হাতে, যেগুলো চুরি করেছিলি তার চেয়ে যেন খারাপ না হয়।' ('কোথায় সে ঘোড়া?' মনের মধ্যে ঝলক দিয়ে গেল বাখতিগুলের।) 'তা ছাড়া যে দোষ করেছিস তার জন্যে একটা ঘোড়া দিয়ে ক্ষতিপূরণের শুরু আর উট দিয়ে শেষ করবি। এই হবে উপযুক্ত ধম্মমতো কাজ!'

বাখতিগুল মুখ হাঁ করেছিল, মুখ হাঁ করেই নিথর হয়ে গেল সে। মনে হল যেন মাথায় সে মুষলের ঘা খেয়েছে। আশেপাশের সবাই-ও যেন গাল ভরা জল নিয়ে মুখ বুঁজে রইল। বোঝা গেল, তারাও স্তম্ভিত হয়ে গেছে...

জানে বাই, ভালোই জানে কতগুলি কি পশু সঞ্চয় করেছে বাখতিগুল। তা জেনেই হুকুম করছে অর্ধেকের বেশিটাই দিয়ে দিতে... উটটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে হবে!

না, না, জারাসবাই নিশ্চয় পরে বাখতিগুলকে এ সব ফিরিয়ে দেবে। তা না দিয়ে পারে কি! ডাক পাঠাবে হাকিম, তার ক্ষোভ মেটাবে, পরের চোখের সামনে নয়, নিজেদের মধ্যে। বাধ্য গোলামকে ঘোড়া উট দেবে, ভালো ভালো কথা কইবে, সংসারের লোকসান, কলিজার মধ্যে লোকসান সব পুষিয়ে দেবে, সব হবে উপযুক্ত, ধম্মমতো।

এই ভেবেই বাখতিগুল অরাজ বংশের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে গেল, সেই সঙ্গেই গেল মুরুব্বি সার্সেন, হাকিমের আদেশ যথাযথ পালিত হল কিনা তা দেখবে সে।

কিন্তু একদিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন — হাকিম আর ডেকে পাঠাল না বাখতিগুলকে। হাকিমের সময় নেই। ভারী ভারী জরুরী কত কাজ তার, একমুহূর্তেই অনুগত বন্ধুর সর্বনাশ করতে, নিজেরই হিংস্র শত্রুদের উপকার করে তার চূড়ান্ত ক্ষতি করতে বাধল না... পায়ে দলে গেল, দলিতের দিকে একবার ফিরেও চাইল না। কেন?

ভেবে কূল পেত না বাখতিগুল। হাতশা ঘুরে বেড়াত মুখ কালো করে, কেঁদে কেঁদে। সৈয়দ বাপের দিকে চাইত কখনো দুর্বোধ্য কখনো চিন্তিত কখনো বা উদাসীন দৃষ্টিতে। মাঝে মাঝে নিজের গোপন কী এক ভাবনায় মৃদু হাসত সে। তাতে ভয় পেয়ে যেত বাখতিগুল, রেগে উঠত।

অনুমানের পীড়ন সইতে না পেরে বাখতিগুল ছুটে যেত আশেপাশের চেনা জানা বন্ধুদের কাছে, আলোচনা করতে চাইত, পরামর্শ নিত, বুঝতে ঠাহর করতে চাইত কি ভাবে চলবে ভবিষ্যতে। কিন্তু লোকে তাকে সভয়ে পরিহার করত। মাথার মধ্যে ঘুরত যত শোনা কাহিনী, যত নীতিকথা —চুল পেকে গেলেও তা থেকে কিছু বার করা মুশকিল। তাই তেকতিগুল মারা যাবার পরে যা হয়েছিল, ঠিক তেমনি মনে হতে লাগল বাখতিগুলের, যেন ক্যারাভান থেকে দলছুট সে এক নিঃসঙ্গ, মরুভূমির মধ্যে পরিত্যক্ত, পথ খুঁজে বেরবার কোনো আশাই তার নেই। ফের অটুট এক পাথুরে দেয়ালের মতো তার সামনে দাঁড়িয়েছে তার অনাথ ভবিষ্যৎ। সমস্ত লোক, গোটা দুনিয়া যেন সে দেয়ালের ওপারে আর একটা কাটা আঙুলের মতো, ছেঁড়া চুলের মতো সে পড়ে আছে এদিকে।

গ্রীষ্মকালের বারিমতা — সে যেন এক মদ্যোৎসব ... আর শরতে শুরু হল তার খোঁয়ারি — বলাই বাহুল্য সেটা ধনীদের বেলায় নয়, গরিবদের বেলায়। বাপ দাদাদের আমলের মতোই শাদাকে বলা হল কালো, কালোকে শাদা, এ ব্যাপারে স্তেপের বাইরা ওস্তাদ। গোলগাল ভুঁড়ি দুলিয়ে অপরাধীরা ঘুরছে তাসের টেক্কার মতো, নিরপরাধীদের ধিক্কার দিয়ে ছেঁড়া কলার ধরে টেনে আনা হচ্ছে — সেই চিরকেলে দৃশ্য, চেনা ছবি।

নির্বাচন শেষ হয়ে বারিমতার বজ্র ঝলক নিভতে শুরু করতেই উয়েজদে উয়েজদে শুরু হল তার দীর্ঘ প্রতিধ্বনি। বড়ো বড়ো রাজপুরুষেরা লম্বা লম্বা পুলিসী কান খাড়া করে

শুনতে লাগল। সদরে সদরে মোটা দেয়ালের কাছারি ঘরে নিজেদের মতো এক সিদ্ধান্ত টানা হল:

'কিরগিজদের মধ্যে (কাজাখদের তখন এই বলা হত) দল বেঁধে অশ্বারোহণ যাত্রা বেড়ে উঠেছে... লড়াকু গোছের লোকেরা অবাধ্য হয়ে উঠেছে। ভগবান করুন কিরগিজী ভলোস্তগুলোর ও সংক্রমণ কসাকদের বসতগুলোয় না ছড়ায়...'

'টহলদাররা, প্রহরীরা রিপোর্ট করে: অবাধ্যতা! রাজকর্মচারীদের প্রতি... উপরিওয়ালার প্রতি অসম্মান।'

ভলোস্ত হাকিমদের পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের দাসোচিত লাগানি-ভাঙ্গানিতে আগুনে ঘি পড়ল তাদের, আর্জিগুলোর গা ভরে বসন্তের গুটির মতো দেখা দিতে লাগল কয়েকটা শব্দ: বিদ্রোহ, বিদ্রোহী, হাঙ্গামাকারী, চোর... আর 'চোর' কথাটা রাজপুরুষদের অভিধা মতো 'বিদ্রোহীর' সমপদবাচ্য।

হঠাৎ শরতের কনকনে এক দিনে বিস্ফোরণের মতো উয়েজদ কেঁপে উঠল পুলিস কর্তার আদেশে। ভলোস্তের সমস্ত হাকিম, আউলের সমস্ত কাজীর সদরে ডাক পড়ল কড়া রকমের জেরা আর ধমকের জন্যে।

এজাহার দিতে গেল গোটা গুবেনির্য়া। কাছারি ঘরের কাঁচের দোয়াতে মর্মরের পেপার ওয়েটের ভরা টেবলের সামনে চ্যাং ব্যাং ছোট বড়ো সবাইকেই নাস্তানাবুদ করে ছাড়া হল। সাবেকী প্রথামতো ভয় দেখানো হল... ভলোস্ত হাকিমদের হুমকি দেওয়া হল পদচ্যুত করা হবে, বংশের কর্তাব্যক্তি আর

দলপতিদের বলা হল পাঠানো হবে নির্বাসনে। আর এই হৈচৈয়ের মধ্যে অতলগহ্বর পকেটগুলো ভরে উঠল ঘুসের টাকায়।

ছাড়ল সবাইকে এই হুকুম দিয়ে:

'দেখো বাপু ভালো মানুষ বাই, তোমার এলাকায় যেন শান্তি থাকে!'

'ঝাঁকুনিটায় পেট মোটাদের ওপর ওষুধের কাজ হল। কড়া কুমিসে চামড়ার নিচে যে নেশা জমেছিল তা পলকেই ছুটে গেল। এমন কি মড়কের মতো ভয়ঙ্কর ঘোঁট-পাকানোর করাল রোগটাও যেন কাটতে লাগল।'

প্রতিপক্ষ দলগুলোর কর্তারা এক জোট হয়ে হৈচৈ করে শহরে গেল ঠিক যেন পরব লেগেছে, শুরু করলে ঘোড়া জবাই... সেরা সেরা ঘোড়া জবাই করা হল ছাই রঙের, ছাই রঙ না থাকলেও আপত্তি হল না, জবাই করা হল ন্যাড়া-কপালে ঘোড়া, ন্যাড়া কপাল না থাকলেও বাদ গেল না, সমস্বরে চিৎকার করে পড়া হল কোরান, আকাশের দিকে তুলে ধরা হল ধোয়া মোছা সুচিকন খানদানী হাত, প্রার্থনা হল: ঝগড়াঝাঁটি যেন শেষ হয়, সব যেন মিটমাট হয়ে যায়। তারপর কোরবান করা রক্ত নিয়ে বহু সাক্ষীর সামনে কসম খাওয়া হল — এবার থেকে চিরকালের মতো লোকজনের মধ্যে হৈহাঙ্গামা শেষ, চুরিচামারি বন্ধ। সেই সঙ্গে সেয়ানার মতো ভান করলে যেন জানে না, সন্দেহও করতে পারে না এই চুরিচামারিটা কে বাধিয়ে তুলেছিল।

অন্যের উদাহরণ মেনে, অন্যদের চোখের সামনে জারাসবাইও মিটমাট করে নিলে সাতের সঙ্গে।

চক্রান্তটা হল মিলেমিশেই, হল অনায়াসেই। শাদা-দাড়ি ডাকাত, ডাকসাইটে মিথ্যুক, মুখের কথা অর্ধেক খসতে না খসতেই বোঝাবুঝি হয়ে যায়, কার ওপর দোষ চাপাতে হবে, কাকে তুলে দিতে হবে পুলিসের কবলে এ সব আঁচ করে নেয় আগে থেকেই যদিও নাম করা হয় না কারো।

বরাবরই এই চলে এসেছে: উয়েজদ কর্তাকে ঘুস না দিলে শান্তি নেই। কিন্তু এবারকার ঘুসটা একটু বিশেষ রকমের — ঘুস দিতে হবে মানুষ, তুলে দিতে হবে অপরাধীকে ...

সদরে জারাসবাইয়ের নিজস্ব একটি লোক ছিল, দোভাষী তকপায়েভ। তার সঙ্গে জারাসবাইয়ের গলায় গলায় দহরম মহরম। শীতে গ্রীষ্মে যে সব দেবতা টাকায় পয়সায় মালে মসলায় পার্থিব নৈবেদ্য পেয়ে থাকে তাদের মধ্যে তকপায়েভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাইয়ের রক্ষক দেবতা, বলা ভালো, ফন্দিদাতা দেবতা। উয়েজদের স্বর্গরাজ্যের এই বাসিন্দার সাহায্যেই একদা সাতকে হাজতের 'আতিথ্য গ্রহণে' পাঠিয়েছিল জারাসবাই, দরকার মতো আর্জি আর উচিত মতো টাকা গুঁজে দিয়েছিল যথাযোগ্য হাতে।

নির্বাচনের পর দোভাষী জারাসবাইকে নিমন্ত্রণ করে তার সদরের বাড়িতে, সোজাসুজি কানে কানে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল:

'সরকারের রাগ উঠছে ... রিপোর্ট আসছে, অনেকেই

রিপোর্ট দিচ্ছে ঘরে তুই নাকি চোর পুষছিস — অনেকেই তারা নাকি খাসা জিগিত, পয়লা নম্বরের ঘোড়া চোর।'

তাদের মধ্যে সবচেয়ে ঝানু নামকরা ডাকসাইটে দু-একটাকে সরকারের হাতে তুলে দেবার পরামর্শ দিলে তকপায়েভ।

'সবচেয়ে বড়ো কথা, নিজেই তার শাস্তি দে, নিজেদের বাইদের আদালতে। নিজেদের লোক দিয়ে চুলের তৈরি ফাঁসে বেঁধে সদরে চালান দে। সবই ঠিকমতো করতে হবে।'

এইটেই জানা ছিল না বাখতিগুলের।

চেলকার ভলোস্তের কাজী মহাসভার দিন এগিয়ে এল। ভলোস্ত হাকিম এ মহাসভা ডাকে তিন-চার মাসে একবার, যখন ঝগড়াঝাঁটি তর্কবিতর্ক জমা হয়ে ওঠে। সাধারণত কাজীরাই বিচার করে, ব্যবস্থা করে, আর তাদের আড়াল নিয়ে রায় দেয় ভলোস্ত হাকিম:

'আমার রায় নয়, আমার হুকুম নয় — বুড়োদের, মুরুব্বিদের রায়...'

কিন্তু এবারকার মহাসভায় সাধারণ ঋণকর্জার মামলা নয়, তোড়জোড় চলল কি এক অসাধারণ জরুরী ব্যাপার নিয়ে, যার জন্যে নাকি দরকার ভারি বুদ্ধি বিবেচনা, তাই মহাসভার জন্যে খুব অধৈর্য নিয়ে খুবই আগ্রহ নিয়ে দিন গুনতে লাগল লোকে। ভলোস্ত হাকিমকেও তাড়া দেওয়া হল। কিন্তু বাখতিগুল জানত না সে কথা।

গরিবের কপালে লেগেই থাকে দুর্ভাগ্য, জীর্ণ চেকপেনের গায়ে যেন তালি। বাখতিগুল যে সময় হতাশ হয়ে ধর্না দিয়ে

বেড়াচ্ছিল পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে, সলাপরামর্শ চাইছিল, ঠিক সেই সময় কজিবাকদের পাল থেকে চুরি গেল গোটা কয়েক ঘোড়া। চোর আর চোরের মাল, কিছুরই হদিশ মিলল না, কিন্তু কজিবাকরা সঙ্গে সঙ্গেই বাখতিগুলকেই দোষী ঠাওরালে। কোনো রকম চিহ্ন যখন নেই, তখন ওই চোর! খামোকাই কি আর বলে: ধন্ধ লাগলে লোকে যা দেখছিল আগে, তাই দেখে পরে।

হারানো মাল খুঁজতে এল দুজন। বাখতিগুলের ঘরে ঢুকে এক বছর আগের মতো তল্লাস করলে কোণে কোণাচিতে। বাখতিগুল প্রথমটা অবাক হয়ে যায়, পরের ভলোস্তে হানা দিয়ে বেহায়াগুলো লাগিয়েছে কি? তবে ওদের নিয়ে আর কথা কী। কজিবাক বংশের ধারা তো! তাহলেও বাখতিগুল ভালো মুখেই ওদের বিদায় করতে চেয়েছিল। কিন্তু গেল না। চোটপাট শুরু করে দিলে যেন ওরাই ঘরের কর্তা:

'ও বছরের মতো সাধ হয়েছে বুঝি? চাবুক খাওয়ার সখ হয়েছে?'

বাখতিগুলের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কালো বাঁটওয়ালা সরু লম্বা ছোরা টেনে নিল সে:

'জান নিয়ে নেব, কুত্তা কোথাকার!'

দেখা গেল পেয়াদা দুজন খুবই সাহসী: মুখে বারফট্টাই, বুকে ফাঁপা। ছোরা দেখেই তারা দে ছুট একেবারে নিজেদের ঘোড়ায়, শুধু গাল মন্দ করে গেল গলা ফাটিয়ে। বহুক্ষণ তারা বাখতিগুলের শীতের ভিটের চারপাশে দূর থেকে ঘোরাঘুরি

করলে, অশ্লীল কদর্য গালাগালি দিলে। শেয়ালগুলো জানত, সিংহ কখনো তাদের পেছু তাড়া করবে না।

সেই দিনই বড়ো এক খণ্ড মাংস রেঁধেছিল হাতশা, সুস্বাদু 'কাভার্দাক' বানিয়ে হাকিমের আউলে গিয়েছিল জারাসবাইয়ের বাড়ি যথাযোগ্য ভেট দিতে। বাইগিন্নি কাদিশা তার সুর্মা আঁকা ভুরু কোঁচকালে শুধু, মাংসটা তুলেও দেখল না। হাতশা তাকে সম্মান করে চাচি বলে ডাকলে, চাচি কিন্তু ঠোঁট বেঁকিয়ে অশ্রদ্ধার পিচ কেটে দেমাক দেখাল, ঠাট্টা করলে। গিন্নির পেছু পেছু ঘরের ঝি চাকরানীরাও হাতশার পেছনে লাগল, তার প্রতি কথাতেই ব্যঙ্গ ভরে হাসলে, মুখের ওপরেই উপহাস করলে।

হাতশা সময়মতো জারাসবাইয়ের সামনেই বাইগিন্নির কাছে ছেলে সৈয়দের কথা পাড়ল।

'বোকাটার খুব মনে ধরে গেছে গো মোল্লার কাছে লেখাপড়া। শান্তি আর দেয় না, কেবলি জিদ, শীত তো এসে পড়ল, কবে পড়তে পাঠাবে মা, কবে পাঠাবে?.. কি যে জবাব দেব জানি না।'

কিন্তু হাকিম কি বাইগিন্নি কেউ মাথাটি ঘোরালে না, কথাটি খসালে না, ঘরে যেন হাতশা বলে কেউ নেই। হতাশ হয়ে ভয় পেয়ে হাতশা ফিরল তার দারিদ্র্যের শীতের ভিটেয়।

তখন বেরয় বাখতিগুল, কিন্তু শিগগিরই ফিরে আসে থমথমে চুপচাপ মুখে। হাকিমের আউলে লোকে তার দিকে তাকায় আড়ে-ওড়ে, কথা বলে দাঁত চেপে। আঙুল দেখায় তার দিকে, পেছনে ফিসফাস করে:

'গোঁয়ার ...'

সেদিনের সর্দার, বাইয়ের প্রিয়পাত্র এইভাবে দিন দশেক কাটালে নিজের মনেই, সবার কাছ থেকেই সে দলছাড়া, ঘর থেকে বেরয় না, কোথাও যায় না, শুধু প্রাণপণে ভাবে কি ঘটল, আরো কি ঘটবে। দিন কাটছিল ঠিক বন্দীর মতো, আর নেহাৎই দৈবক্রমে, পথচলতি সওয়ারীর কাছ থেকেই বাখতিগুল জানতে পারল চেলকারে বিচার মহাসভা চলছে আজ তিন দিন।

লোকে বললে, যে সব কাজীরা এসেছে তারা ভয়ানক রকমের নিষ্ঠুর, বদরাগী। কড়া তাদের বিচার, শাস্তি দিচ্ছে ভয়ানক, মায়া নেই, মাপ নেই। কি এক কালা তালিকা নাকি তৈরি হয়েছে, চোর বলে তাতে ঘোষণা করা হয়েছে জনকুড়ি লোককে। তালিকায় কার কার নাম আছে কেউ জানে না, কিন্তু নাম যাদের আছে সে হতভাগাদের কপালে কয়েদখানা খণ্ডাবার নয়।

কে জানে কোথায় হাতশা তার একজনের নাম শুনেছে — জাদিগের। আর গোটা বছর ধরে বাখতিগুলকে যা কখনো সইতে হয় নি তেমন একটা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল সে। জাদিগের — জোয়ান জিগিত, গ্রীষ্মে বারিমতাগুলোর সময় সে ছিল সর্দারের ডান হাত।

'শনির নজর ঠিকই আছে কাকে তাক করবে, কার ওপর ঝাঁপাবে।' মনে মনে ভাবলে বাখতিগুল, 'এবার তাহলে আমার পালা।'

সে দিন থেকে প্রায় একবারও সে হাসে নি, মুখে কিছু তোলে নি, ঘুম হয় নি একেবারে, কারো সঙ্গে কথা কয় নি।

ফারের টুপিটা চোখ পর্যন্ত টেনে সে চিৎ হয়ে পড়ে থাকত তার ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর, নড়ত না, হাত পা যেন তার বাঁধা। মনে হত গোটা দুনিয়া যেন তার স্তিমিত চোখের সামনে উল্টো হয়ে ঘুরে গেছে।

শুয়ে শুয়ে কাল গুণত কবে তার ডাক পড়বে।

সে ডাক পড়ল। পেয়াদার সম্মানী থলি কাঁধে এসে দাঁড়াল লোক, হুকুম হল সঙ্গে যাবার।

পরিষ্কার, গোছগাছ জমকালো এক উঁচু আট দড়ির তাঁবুর নিচে কম্বল আর পালকের নরম তাকিয়ায় ডুবে গিয়ে গা এলিয়েছে ভুঁড়িপেটের দল; দিন রাত চলেছে মাংস ভোজন, বুঁদ হয়ে আছে ভরা পেটে। খাচ্ছে আর বিচার করছে... ঠিক একেবারে ঘোড়া মড়কের আউলে কুকুরগুলোর মতো — রক্ত রাঙা চোখ, নেতিয়ে পড়া লোম, গুটিয়ে আসা লেজ, ক্ষেপে গেছে যেন। মরা ঘোড়ার মাংস খাচ্ছে, লোক দেখলেই খেঁকিয়ে আসছে।

যেন লম্বা ব্যামোর পর দাঁড়াতে পারছে না বাখতিগুল, কোনো রকমে পায়ের ওপর খাড়া হয়ে এগুল সে, দরজায় দাঁড়িয়ে অস্ফুটে সেলাম জানাল। কেউই তার দিকে চাইল না দরদের চোখে — না রুক্ষ দর্শন মুরুব্বিরা, না দিলদরাজ সার্সেন। কাজীরা মুখ ঘুরিয়ে নিলে, সেলাম নিতেও যেন ভয় হচ্ছে তাদের, মাছের মতো চোখগুলোকে গোলগোল করে পাকিয়ে তারা চেয়ে রইল তার দিকে, তাদের সেলাম জানানো হচ্ছে এই স্পর্ধা দেখে সে চোখ যেন বা একটু ফ্যাকাশে। একটা লোকও পেলে না বাখতিগুল, যে তার

কুশল শুধাল, ঘর সংসার দিন কালের কথা জিজ্ঞেস করল।

'এবার বুঝলি তো ব্যাপারটা কি?' সামান্য উপহাসের সুরে বাখতিগুল প্রশ্ন করল নিজের মনে, আর নিজেরই অজান্তে হঠাৎ যেন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সত্যিই যেন তার আলো হয়ে উঠল বুকের মধ্যে, পরিষ্কার হয়ে এল মগজ। এ তো জানা কথা, চিরকেলে ব্যাপার। দুনিয়ায় ন্যায় নেই, হক নেই, এই মাত্র। খুবই সোজা কথা।

'জান আমার পরিষ্কার, কোনো কসুর কোনো গুনাহ নেই আমার,' মনে মনে বললে বাখতিগুল, 'আমি যদি চোর হই, তাহলে তোমরা তিনগুণো চোর, আমার দোষ ধরার আমার বিচার করার হক নেই তোমাদের। খোদা আমার সাক্ষী!'

নিজের সঙ্গেই যেন সে তর্ক করছিল, নিজের কাছেই প্রমাণ করছিল নিজের সততা। ইতিমধ্যে কাজীরা শুরু করে দিলে তাদের বিচার।

বলাই বাহুল্য কজিবাকরাই ফরিয়াদী, সসম্ভ্রম মনোযোগ দিয়ে কাজীরা শুনল তাদের মুরুব্বির বক্তব্য। তারপর তৃপ্তির গলা খাঁকারি দিলে তারা, চোখ রাঙালে, তারপর একসঙ্গে আক্রমণ করলে আসামীকে।

কিন্তু যতই ওরা ভয় দেখাক, মাথা নিচু করলে না বাখতিগুল। আগের মতোই অস্বীকারও করলে না কিছু। এক দুই তিন — একের পর এক কাজীর প্রশ্নে অচঞ্চলে জবাব দিলে সে:

'মিথ্যে বলি নি, মিথ্যে বলবও না, হ্যাঁ কজিবাকদের পাল লুট করেছি।'

'কেন লুটেছিস? কি কারণে?'

'এইজন্যে, এই কারণে যে আমি ছিলাম তোমাদের দলে!'

চেলকারের কাজীরা সবাই মুহূর্তের জন্যে দমে গেল। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললে, চুপচাপ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে সবাই। কজিবাক পক্ষের এক কাজী বেঁটেখাটো, কালোকুলো, সূচের মতো খোঁচা খোঁচা মোচ — সে উদ্ধার করলে তাদের।

'আরে বাবা! দলের ব্যাপার... কী পোড়া কপালে দল!' আকণ্ঠ হাসি হেসে চেঁচাল সে, 'দল দেখছি সবাইকারই কাজে লাগে। দল বোধ করি তোকে গাধার মতো পিঠ পেতে দিয়েছিল চাপার জন্যে? নাকি রে, কী বল, বল!'

চেলকাররা চাঙ্গা হয়ে উঠল, চকচকে ঠোঁট চেটে হেসে উঠল।

'কিন্তু সাত কি অরাজের সঙ্গে তোর দলাদলির সম্পর্কটা কী বল তো বাপু? কোনো জন জমায়েতে ঝগড়া হয়েছিল তোর সঙ্গে, চেলকার ভলোস্তের পক্ষ নিয়েছিলি, লোকের অভাব অভিযোগ মেটাতে চেয়েছিলি? তা যদি হয়ে থাকে তবে সেটা কবে... দয়া করে আমাদের একটু মনে পড়িয়ে দে তো বাপু!'

কাজীরা পেটে হাত চেপে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

'আর কিসের শোধবোধে তুই কজিবাকদের ঐ পাঁচটে ঘোড়া মারলি? এইটে বাপু মনে করে বল... ফর্দমতো ঐ পাঁচটি ঘোড়া!'

বাখতিগুল তিক্ত বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাইল। এত হাসি কেন এদের? প্রথমটা সে নিজেই ভাববার চেষ্টা করল কোন পাঁচটা ঘোড়ার কথা হচ্ছে। পরে বাইদের এত খুশি দেখে নিজেরই হাসি পেল। সবেতেই ওদের মজা, সর্বদাই মজা, আপন লোক, পরের লোক, বাদী, কাজী সবেতেই ওদের মজা।

'পাঁচটা ঘোড়া কি দশটা ঘোড়া — হ্যাঁ তা নিয়েছি...' ভাঙা গলায় বললে বাখতিগুল, 'কটা নিয়েছি সে তো তোমরাই ভালো জানো আর নিজের ভলোস্তের পক্ষে দাঁড়িয়েছি সে তো বটেই, নিজের কথা ভাবি নি, নিজের মায়া করি নি। তোমাদের জন্যেই লড়েছি লুটেছি, মাথা ফাটিয়েছি, সে সবই কর্তার জন্যে, কর্তার পেট ভরাতে...'

কাজীরা সমস্বরে হট্টগোল করে উঠে ওকে থামিয়ে দিলে।

'ইস, বড়ো যে বাড়! ঘানিকলে যাবার সাধ!'

'ল-ড়ে-ছি!.. কি বেয়াদবি... এ সব কথা কার কাছে শিখলি?'

'লড়েছি, মানে চুরি করেছি! ওর কাছে ও একই কথা।'

'নিজেই বললে পাঁচ নয় দশটা...'

'বুঝতে পারছি না,' আত্মসংযম রেখে বললে বাখতিগুল। 'কি চাইছ তোমরা, গণ্যিমান্যি লোকেরা?'

'তোর দুষ্কর্মের বিচার করছি,' ধমকের সুরে বললে মোড়ল কাজী, 'বেয়াদবি বাকতাল্লা বন্ধ কর বলছি!' এবং এ ধরনের ধমক দিতে পারার পরিতৃপ্তিতে গম্ভীর চালে শাদা-দাড়িতে হাত বুলিয়ে টেনে টেনে জানাল, 'যা তোর এক্তিয়ারের বাইরে,

ক্ষমতার বাইরে, গোলামী মগজের বাইরে, তা নিয়ে মাথা গলাতে আসিস না। যার এক্তিয়ার, খোদা যাকে বসিয়েছে সেই তার নিজের কাজ নিজে বুঝবে, উঁচু খেয়ালে বলবে, সে তোর বোঝার বাইরে। আমাদের ভলোস্তের পার্টি বহুকাল আগেই এই সব ঘোড়া মোড়ার ময়লা চুকিয়েছে। বুঝেছিস, ওসব বহুকাল চুকিয়ে দিয়েছে, দিল সাফ করে নিয়েছে। নিজেদের সাফ করে নিয়ে কানুনী ফরিয়াদ চালিয়েছে খাঁটি পথে, হক পথে। এবার নিজের দোষের জবাব দেবার পালা তোর, তোরই ডাক পড়েছে!'

'কিন্তু আমার দোষটা কোথায়?' হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করল বাখতিগুল, 'নিজের জন্যে তো নিই নি, লুটের মালে নিজের ধন তো বাড়ে নি। হুকুম মেনে নিয়েছি, ইচ্ছের বাইরে। হুকুম মেনেছি বলে কি দোষী বলো তোমরা?..'

'বটে, বটে! তা চুরি করার হুকুমটা তোকে দিল কে বল তো?' নির্লজ্জ চোখগুলোকে গোল গোল করে জেরা করলে কজিবাকের লোক।

বাখতিগুল মাথা হেঁট করল। দ্বিধা লাগল তার। এই সব লোকের মুখের দিকে চাইতে, তাদের কথা শুনতে, জবাব দিতে লজ্জা বোধ হল তার।

'মুখে রা নেই যে! নিন্দুক কোথাকার...'

'আমি না বলে বরং ওরাই বলুক,' সখেদে বললে বাখতিগুল।

'বেশি দূর যেতে হবে না, বেশি খোঁজা খুঁজতে হবে না... ওই তো বসে আছে মান্যির আসনে।' আঙুল দিয়ে সে দেখাল

সার্সেন আর কোকিশের দিকে, সবেমাত্র তখন ইয়ুর্তায় ঢুকেছিল কোকিশ হাতে জমকালো চাবুক নিয়ে। 'তা আমার এক্তিয়ারের বাইরে হলেও দেখতে চাই ও পাঁচটা ঘোড়ার ময়লা থেকে তারা কি ভাবে সাফ হল... উঁচু খেয়ালটাই বা এখানে কেমন ধারা ...'

রাগে ফুঁসে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে কাজীরা। জুটে পড়া দর্শকদের মধ্যে হিংসার, উপহাসের একটা ফিসফিসানি শুরু হল। ভুখা-নাঙ্গা নফর ধনীদের ক্ষমতার মোকাবেলা করছে বড়ো বেশি নির্ভয়ে, বড়ো বেশি বুদ্ধিমানের মতো। ন্যায়ের সখ হয়েছে গোলামের। সহজে দেখছি গোলামটাকে থামানো যাবে না।

উদ্ধত ভঙ্গিতে গাল ফুলিয়ে সার্সেন চুপ করে রইল। কালো মোষের মতো গাঁট্টাগোঁট্টা কোকিশ চাবুক হাঁকিয়ে হুমকি দিয়ে হেসে উঠল।

বললে, 'মনে রাখিস কিন্তু, দলাদলির দ্বন্দ্ব এক কথা, আর চুরি অন্য কথা! দলাদলির জবাব দিতে হয় আমরা দেব, তোর জবাব দিতে হবে যে বাছাধন অন্য ব্যাপারটায়। ধাপ্পা দিতে যাস না বাপু... বেরবার পথ পাবি না।' (এ সব কথা ওর মাথা থেকে বেরুচ্ছে? ভাবল বার্খাতিগুল।) কাজীদের উদ্দেশ করে তাড়াতাড়ি বলে গেল কোকিশ, 'ও যে শুধু আমাদের নয়, আরো পঞ্চ জনের, খোদ জারাসবাইয়ের মুখে কালি দিচ্ছে, এ কি চলতে দেওয়া যায়! ভলোস্তের হাকিম আমায় অবিলম্বে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে, কি বলতে বলেছে শুনুন: নির্বাচনের কথা এখানে আসে না, আপনাদের সামনে এ একটা

চোর!.. এ নচ্ছার চুরির কথা নিজেই কবুল করেছে। চোরের বিচার করে শাস্তি দিন।'

বাখতিগুলের পেশল মজদুরী হাতদুটো যেন সমস্ত বল হারিয়ে ঝুলে পড়ল।

'আমি… আমি চোর? হাকিম এই কথা বলেছে?' শিশুর মতো সারল্যে সে জিজ্ঞেস করলে। তবে জবাবের তার প্রয়োজন ছিল না।

তার চোখের সামনে যাই ঘটুক না কেন, মনের গভীরে সে তখনো আশা করেছিল, শেষ মুহূর্তে হাকিমের কথা, হাকিমের একটি মাত্র মুখের কথায় সে দুর্ভোগ থেকে খালাস পাবে। 'আমি এ অভাগার দায়িত্ব নিচ্ছি!' শুধু এ কথাটা বললেই হত। আর কিছু দরকার হত না। কাজীরা তাকে অন্যায় করে শাস্তি দিলেও সারা জীবনে বাখতিগুল সে কথা ভুলত না। কবরে শোয়ার সময়েও বাখতিগুল এ কথাটা সঙ্গে নিয়ে যেত: 'আমি অভাগার দায়িত্ব নিচ্ছি…'

অজান্তেই বাখতিগুল তার কড়াপড়া আঙুল দিয়ে গালের জখমটা পরখ করে নিল — ফুলে ওঠা খোঁচা খোঁচা একটা জখম, ঠিক যেন ঘোড়ার গায়ে দাগা মার্কার মতো — বনশুয়োর সালমেনটার সঙ্গে তার শেষ মোলাকাতের চিহ্ন। ঠিক তেমনি অনপনেয় একটা ক্ষতই আজ ফুটে উঠেছে তার বুকের মধ্যে, কলজের মধ্যে তার খুন ঝরতে লাগল।

হৃদয়হীনতা কতদূর যেতে পারে, কতদূর যেতে পারে বিশ্বাসভঙ্গ, সেটা কি তাকেই জানতে হবে, সে জ্বালা কি তারই অনাথ কলজেটায় সইতে হবে…

'বেশ, এই যদি হাকিমের কথা হয়,' বললে বাখতিগুল, 'কোকিশ যদি মিথ্যা না বলে থাকে, তাহলে এই আমি মুখ বুঁজলাম, মরার মতো চুপ করে থাকছি আমি। তোমাদের যা ইচ্ছে করো — জান নাও আমার। সে জান যে কুত্তার অধম। একটা গরিব ছিল, একটা গরিব রইল কি রইল না, কি এসে যায়! শুধু একটা কথা শেষ কথা: আমি যে বিশ্বাস করেছিলাম... বিশ্বাস করেছিলাম গো! ফুঃ, যাক গে... খোদা দেখবেন, আমার যা কাজ সেটা...' কথাটা শেষ না করেই বাখতিগুল মাথা নিচু করে উঠে বেরিয়ে গেল ইয়ুর্তা থেকে।

গেল সে অন্ধের মতো, ঠোঁট কামড়ে, গলা দিয়ে কুকুরের মতো আর্তনাদটা যাতে না বেরয়। বেরতেই সামনে দেখল হাকিমকে। খানদানী আলখাল্লা পরা চারটে মুটকো আর জারাসবাই ধীরেসুস্থে তার সামনে দিয়ে ভারিক্কী মেজাজে আলাপ করতে করতে চলে গেল। বাখতিগুলের সেলামটাও যেন জারাসবাইয়ের নজরে পড়ল না, চোখ তুলেও দেখল না! কি জঘন্যতা, কি নির্লজ্জতা!..

জারাসবাইয়ের পিঠের দিকে তাকিয়ে বাখতিগুল এই প্রথম দাঁত কড়মড় করলে।

ছুটে এল পেয়াদা, ডাকলে রায় শুনতে। পেয়াদার পেছু পেছু এল বাখতিগুল।

কাজীরা হুকুম দিলে, ঐ পাঁচটা ঘোড়ার জন্যে ন্যায্যমতে পাঁচটি ঘোড়া দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। আর চুরির জন্যে তিন বছর জেল।

৮

শক্তসমর্থ দুজন জিগিত নিয়ে গেল আসামীকে।

স্তেপ এলাকায় লোহার গারদ দেওয়া কোনো জায়গা ছিল না, লোককে খিল এঁটে রাখারও উপায় নেই, তাই সদরে চালান পাঠাবার আগে আসামীর পায়ে বেড়ি পরানো হত, প্রতিটি বেড়িতে ঝুলত বড়ো বড়ো তালা।

প্রথমটা বাখতিগুল এমন বিহ্বল হয়ে যায় যে মাথায় ঢুকল না কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে। জিগিতদের দিকে চেয়ে ঘোরের মধ্যে ভাবলে, কি দুবলা রোগা চেহারা...

জিগিতদের একজন বললে, 'দাঁড়া এখানে।' অন্যজন গিয়ে নিয়ে এল মর্চে পড়ে বাদামী হয়ে যাওয়া শেকল, বাখতিগুলের পায়ের দিকে চেয়ে সে সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বাখতিগুল হঠাৎ বিতৃষ্ণায় লোকটাকে এমন একটা ধাক্কা দিলে যে প্রায় উল্টে পড়ল লোকটা, করুণ একটা ঝনঝন শব্দে ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়ল বেড়ি। দ্বিতীয় জিগিত তাই দেখে ছাগলের মতো লাফিয়ে পালাল।

বাখতিগুল নিজের ঘোড়ার কাছে গিয়ে লাফিয়ে উঠল জিনে, ইয়ুর্তাগুলোর মধ্যে মৃদু গতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে অন্যমনস্কের মতো বিদায় জানালে, 'চললাম গো...'

জিগিতদের হাতিয়ার ছিল না, ডাকসাইটে বারিমতা সর্দার ঘোড়ায় উঠে বসেছে দেখে তারা যদি হল্লা শুরু করে দেয়, তবে সে কি তাদের দোষ?

'এই, ওহে! কোথায় চললে? ধর! ধর! বাঁধ!..' কিন্তু স্তেপ

এলাকায় কাজাখ, সে তো মাঠের বাতাস! জিগিতরা ওদিকে হল্লা তুলতে না তুলতেই যে টিলাটার গা ঘেঁসে আউল, তা ততক্ষণে পেরিয়ে চলে গেছে পলাতক, উধাও হয়ে গেছে পাহাড়তলির পাথর-ভরা খাঁজ-কাটা মাঠ আর খালের মধ্যে। পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে যাদের পাঠানো হয়েছিল তারা যদি পলাতকের ঘোড়ার দাগ খুঁজে না পায় সেও কি তাদের দোষ? মানুষ তো আর কুকুর নয়! রাগে লাল হয়ে উঠল ভলোস্তের হাকিম, ধমকাধমকি লাগাল কাজীরা, আসামীকে ছেড়ে দেয় এমন অবহেলা, হুমকি দিলে সদরের পুলিসের হাতে তুলে দেবে। শিকার কিন্তু পালাল।

নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই পালাল সেই জীবনে, যেটা সে বরাবর এড়িয়ে চলতে চেয়েছে, একবার গেলে যেখান থেকে ফেরার আর পথ নেই।

কোথাও না থেমে বাখতিগুল সোজা হাজির হল বাড়িতে, কোনো কথা না কইলেও হাতশা বুঝল কি হয়েছে। কান্না নয়, কাটি নয়, সঙ্গে সঙ্গেই সে তার গরম জামাকাপড় গোছাতে লেগে গেল।

অন্য একটা ঘোড়ায় চটপট জিন চাপালে বাখতিগুল, ধূসর রঙের দৌড়বাজ ঘোড়া, বাখতিগুলের এই এখন একমাত্র সহায়। পিঠে বাঁধলে সাবেকী টোটা-ভরা গাদাবন্দুক। গ্রীষ্মে যে রিভলভারটা পেয়েছিল সেটা গুঁজলে কোমরবন্ধে। এখন আর সেটা খেলনা নয়।

তারপর চলে গেল অদূরের কালো পাথুরে শিলার কাছে। এখানে সে তার শেষ ভেড়াটাকে কাটলে, চটপট মাংস ভাগ করে

ফেলল। অর্ধেকটা রাখলে সংসারের জন্যে, বাকিটায় কড়া করে নুন দিয়ে শুকনো আঁতের তৈরি থলিতে ভরলে। সন্ধ্যায় আঁধারে হাতশা তার জন্যে নিয়ে এল থেঁতলানো মিলেট, বাখতিগুল তাকে মাংসটা দিয়ে দিলে। তারপরে বাদামী রঙের পুরুষ্টু ঘোড়াটাকে সে লাগাম ধরে রইল।

বিদায়টা হল সংক্ষিপ্ত। আল্লার হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে, কবে ফিরবে তার একটি কথাও না বলে বাখতিগুল রাতের আঁধারে মিশে গেল।

তখনও কাঁদলে না হাতশা, শুধু শুকনো ঠোঁটে বললে:

'হারে, দু-মুখো দু-কলজে জারাসবাই!.. আমার মরদকে যেখানে পাঠাচ্ছি তোর বৌ যেন তোকেও সেখানে পাঠায়!.. আমার ছেলেমেয়ের যা হাল, তোর ছেলেমেয়েরও যেন সেই হাল হয়...' অতল আকাশের দিকে সে তাকালে প্রার্থনা নিয়ে — তার এ অভিশাপ যেন নচ্ছার বেইমানকে রেহাই না দেয়।

সেই রাতেই ফেরারীর বাড়িতে হাজির হল হাকিমের পেয়াদা। কিন্তু হাতশার কাছ থেকে কোনো খবরই বেরল না।

মুখে হাসি টেনে সে বললে, 'সকালে তো তোমাদের ওখানেই গেছে, কি ঘটল অমন?' চোখ তার কিন্তু জ্বলছিল রোষে আর গর্বে।

দু'সপ্তাহ কাটল। জারাসবাই তল্লাস চালালে আমূলভাবে, যাকে বলে হাতে মশাল নিয়ে।

দিনে রাতে জন দশেক ঘোড়সওয়ার আর ঘোড়া থেকে নামারও সময় পেলে না, উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম, সারা পাহাড়

চষে ফেললে। বুর্গেনে, চেলকারে লোকে জানত বাখতিগুলকে খুঁজে বার করা সহজ নয়, সহজে সে ধরা দেবে না, জারাসবাই তাই ঠিক করলে ফেরারীকে পেটে মারবে, স্বস্তি দেবে না। এক লোক হাঁপায় তো আরেক লোক আসে, এক ঘোড়ার বদলে আরেক ঘোড়া, পাহাড় পর্বত ঢুঁড়ে বেড়াল হাকিমের লোকেরা, আউলে আউলে, শীতের ভিটেয় হানা দিল, সর্বত্রই চৌকি বসালে — ফেরারী যেন জিরতে না পারে, ঘোড়া তার হয়রান হয়ে যায়, অনবরত তাড়া যায়, তাড়ায় তাড়ায় হয়রান করে ধরবে তাকে। তল্লাসে নামল নামকরা শিকারীরা — পাহাড়ের প্রতিটি খোঁদল প্রতিটি পাথর যাদের নখদর্পণে, তল্লাসে নামল ডাকসাইটে চোরেরা, সূচিভেদ্য আঁধারেও যাদের নজর চলে, ভয়কাতুরে ভেড়ার নাকের সামনে দিয়েও যারা গলে যেতে পারে।

অন্ধকারে ধোঁয়ার মতো বাখতিগুল এড়িয়ে গেল তাদের, কিন্তু ভোগান্তি তার কম হল না।

অন্ধ বধির এক জেলখানা, ঠিক যেন প্রেতের মতো পাথুরে হাঁ মেলে তাকে তাড়া করে ফিরল পায়ে পায়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বাখতিগুল প্রার্থনা করলে:

'বাঁচাও খোদা... শক্তি দাও!'

রূপকথার সাহসী শিকারী কুলামের্গেনের পেছনে দ্রুতগতি এককুঁজওয়ালা উটে চেপে ডাইনী যেমন ধাওয়া করেছিল, তেমনি করেই অবিরাম অক্লান্ত তাকে ধাওয়া করলে শত্রু। মাঝে মাঝে সে স্বপ্ন দেখত পেছনে তার যেন এগিয়ে আসছে বনজোড়া হুহু করা এক দাবানল, নয়ত বা প্লাবনের

দীর্ঘ নীলাভ জিহ্বা সাপটে আসছে তার দিকে। ঘুম ভেঙে যেত তার কখনো ঘামে, কখনো ঠাণ্ডায়। মাঝে মাঝে দৃশ্যটা তার কাছে বাস্তব বলে মনে হত, অনেক সময় স্বপ্ন থেকে সত্যিকে সে আলাদা করতে পারত না, নিজের গায়ে থুতু দিত সে অপচ্ছায়াটা তাড়াতে, প্রেতের আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে আসতে।

এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন ঘোড়াটা তাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় বয়ে নিয়ে গেছে, পশ্চাদ্ধাবকদের কবলে পড়ে নি সে, অচেতন সওয়ারী উল্টে পড়ে নি ঘোড়া থেকে। সম্বিৎ ফিরে বাখতিগুল ধন্যবাদ দিয়েছে ভাগ্যকে, এ ঘোড়া যে মস্তবড়ো সহায়। ফিসফিস করে সে বলেছে:

'কিছুতেই হার মানব না... জান থাকতে নয়... ঘোড়ার পিঠের ওপরেই মরব... জান খোদাকে দেব, বাইকে নয়... কয়েদের ফটকে ঢোকার চেয়ে বরং খাড়াই চুড়ো থেকেই লাফ দেব...'

কিন্তু প্রায়ই গলায় যেন ওর বিষাদ চেপে ধরত, ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠত সে, ফাঁসের দড়ির টান খাওয়া ঘোড়ার মতো। আজ হোক কাল হোক ধরবে ওকে, এই মোটা মোটা লোলুপ হাতগুলো তাকে শেকলে বাঁধবে। মরার ইচ্ছে তার নেই। তার দড়কচা অবসন্ন দেহের মধ্যে দপদপ করছে উত্তপ্ত রক্ত। শোচনীয় দর্শন নিভন্ত একটা অগ্নিকুণ্ডের সামনে উঁচু হয়ে বসে ঠিক তুহিন চাঁদনি রাতের নেকড়ের মতো পাহাড় চুড়োর দিকে মাথা তুলে সে বললে:

'চরমে নিয়ে যাস না জারাসবাই...' তার নিখুঁত প্রতিধ্বনি ফিরে এল পাহাড়ে লেগে।

জারাসবাই সন্দেহ করত ফেরারীর পক্ষে গরিব আউলেই আশ্রয় পাওয়া সম্ভব, লুকিয়ে রাখবে, খাওয়াবে। তাই সর্বত্র পেয়াদা পাঠাল হুমকি দিয়ে:

'আউলের মধ্যে ফেরারী ঘোরাফেরা করলে কারো কপালে শান্তি নেই। বলা যায় না শহর থেকে পুলিস পল্টন এসে হানা দেবে… তখন সবই যাবে। একজন বেয়াদবের জন্যে শত শত নিরপরাধ বুড়োরা হাহাকার করবে, বালবাচ্চা মেয়েরা কাঁদবে, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না!'

সেই সঙ্গেই জারাসবাই বিশ্বাসী লোক পাঠালে প্রভাবশালী আকসাকালদের কাছে, তারাও যেন হাত গুটিয়ে চুপচাপ না বসে থাকে। ভীরু হোক সাহসী হোক, ভালো হোক মন্দ হোক সবার মনেই ভয় ঢোকালে শয়তানটা। মাটিতে ছাড়লে কুকুর, আকাশে ছাড়লে বাজ।

গোপন আশ্রয়, গোপন অন্নমুষ্টির সম্ভাবনা তার একেবারে গেল। এক হপ্তা যেতে না যেতেই সে টের পেল চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেছে সে, শিকারী কুকুরের বেড়ের মধ্যে যেন ভালুক। পাহাড়ে ঝোপঝাড়েও তেমন ভরসা রইল না। খবর পেল কি ভাবে লোককে ভয় দেখিয়েছে শেয়ালটা। পোড়-খাওয়া লোকেরাও ভয় পেয়েছে… এখন আর কাকেও বিশ্বাস নেই, কেউ তেড়ে আসে, কেউ ভয়ে পালায়, কেউ বা আবার ধরিয়ে দিতে রাজী, ভয় পেয়ে কেউ বা খুন করতেও পেছবে না।

শেষ বারের বাদলা রাতটা সে কাটিয়েছে একেবারে অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে, লোকজনের সঙ্গে একই চালার নিচে; ছোট্ট একটা

পাহাড়ে আউল সেটা, উঁচু একটা শিলার নিচে ছন্নছাড়া একটেরে একটা ইয়ুর্তায়। ফেনায়িত খরস্রোত পাহাড়ে নদী তালগার এই জায়গাটা থেকেই শুরু হয়েছে।

গোড়া থেকেই সে টের পেল হালটা সুবিধের নয়, আগের মতো নয়, ব্যবহারটা মানুষের মতো নয়। বাখতিগুলকে ঘরে তোলা হল ভ্রূকুটি করে, আপাদমস্তক নজর করা হল তাকে, যেন বা সে সাপ সঙ্গে করে ঢুকেছে। রাতে অনেকক্ষণ ধরে তার কানে এল গৃহকর্তার অস্থির চাপা ফিসফাস, ফিসফাসটা যেন তার কাছ থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা হল। অবশেষে শান্ত হল ফিসফাস, কিন্তু বাখতিগুল ঘুমতে পারল না। ঘণ্টা খানেক ঝিমল সে, ক্লান্তিতে টনটন করছিল পিঠ, খানিকটা ঠিক করে নিল, তারপর ভোরের আলো ফুটবার অনেক আগে উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, লোকের গায়ে আলগোছেও ছোঁয়া লাগল না। পায়ের ওপর দাঁড়িয়েই অঘোরে ঘুমচ্ছিল ঘোড়াটা, সেই অবস্থাতেই জিন পরিয়ে চলল সে, ভালো করে যাচাই করে নিলে লোকের চোখ নজর দিচ্ছে কিনা। গেল সে দুঃখ নিয়ে, লজ্জা নিয়ে, কিন্তু কোনো বিদ্বেষ ছিল না তার। খোদা কা শুক্র্, এখনো কেউ তার পথ আটকে দাঁড়ায় নি।

বুর্গেন ভলোস্তে বাখতিগুলের দোস্ত ছিল একজন রুশী চাষী — বুড়ো হতভাগা, ভারি সাহসী লোক। তিন বছর আগে বাখতিগুল যখন সালমেনের কাছে কাজ করছে তখন বারিমতার সময় তাদের যোগাযোগ হয়, সেই থেকে দোস্তি জমে ওঠে তাদের। লোকটার সাহস আশ্চর্য: সদরের বড়ো বড়ো কর্তাদের

বিরুদ্ধতা করে সে, লোকটা রুশী হলেও রুশী সায়েবরা তাকে জেলে পোরে। বছর খানেক গারদে আটক ছিল সে, আর যতদিন সে আটক ছিল সেই সময় বাখতিগুল যথাসাধ্য তার এক পাল ছেলেমেয়েদের রুটি মাংস খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে। ফিরে এল লোকটা একেবারে জর্জরিত দেহে, কিন্তু জেলখানার জীবন নিয়ে এমন ঠাট্টা করে গল্প করত যে বাখতিগুলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। কাজীর বিচারের পর ছেলে বৌয়ের কাছে বিদায় নিয়ে তার কাছেই বাখতিগুল প্রথম এসেছিল, লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে সর্বাগ্রেই মাটি খুঁড়ে বার করে লুকনো গুলিবারুদ আর পিস্তলের জন্যে কার্তুজ।

এ বন্ধু শক্ত লোক। পুলিসের ভয় পায় না। কিন্তু লোকটা থাকে অনেক দূরে, খোলা স্তেপে, লোকজনের মধ্যে।

আরো একটা আশ্রয় ছিল বাখতিগুলের — তালগার নদীর ভাটির দিকে, লাল পাহাড়ে, গরিব কাতুবাইয়ের ঘরে। অন্য ঘরের চেয়ে এই ঘরটাতেই বাখতিগুল আসত বেশি, সর্বদাই সেখানে তার দ্বার খোলা। নিজের পিতৃপুরুষের ভিটে ছাড়ার পর কাতুবাইয়ের ঘরখানাই তার কাছে হয়ে ওঠে সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে হার্দ্য। বাখতিগুল ভাবলে একবার ওখানে গিয়েই দেখবে, যদি দেয় তো চা খেয়ে একটু গরম হয়ে নেবে, যদি বলে তো শুনবে চারপাশের খবর, ঘোড়াটাকে একটু আরাম দেবে, আর সন্ধ্যা হলে অন্ধকারে পাড়ি দেবে পাহাড়ে।

পাহাড়ের খাড়াই গা বেয়ে ওপর দিকে উঠে যাওয়া পাইন গাছের বনটায় এসে পেঁছিল সে, সাবধানে তাকিয়ে দেখল চারিদিকে। নিচে ফুঁসে উঠছে তালগার, সমস্ত জায়গাটাকে ভরে

তুলেছে তার কলরোলে। কাতুবাইয়ের ঘরের আশেপাশে এবং আঙিনায় মনে হল যেন বাইরের লোক কেউ নেই। জিন পরানো ঘোড়া কিছু দেখা গেল না। বাখতিগুল ধীরে ধীরে এগুল ফটকের দিকে, নেমে ঘোড়াটা বেঁধে ভেতরে ঢুকল।

বউ আর দুটি ছেলে নিয়ে কাতুবাইয়ের সংসারে চারজন লোক। নিজেদের আত্মীয়স্বজনদের থেকে আলাদাভাবে স্থিতু হয়ে বাস করত তারা। আত্মীয়স্বজন সবাই যাযাবর, ঘুরে বেড়াত সারা বছর ধরে। দেখা হত ক্বচিৎ কদাচিৎ, হঠাৎ হঠাৎ, তার জন্যে কোনো পক্ষ থেকেই খুব একটা আগ্রহ ছিল না। গ্রীষ্মে ফসল বুনত কাতুবাই, শীতে পাল চরিয়ে বেড়াত — তবে পাল তার ঘোড়া, ছানাপোনা সমেত কয়েকটা ছাগল — এই নিয়েই গরিবের তুষ্টি। তাছাড়া শিকারেও নামত সে, ছোটখাটো পশুপাখির জন্যে ফাঁদ আর জাল পাতত, বড়ো সড়োর জন্যে গুলি। এ দিয়েও খাওয়া চলত তার। শিকারে কাতুবাইয়ের সখ ছিল খুব। তাকে তার নিজের দামী গুলিবারুদের ভাগ দিত বাখতিগুল, নিজেও সে ভালোবাসত অলক্ষ্য চিহ্ন ধরে এগুতে, দূর থেকে একগুলিতেই শিকার দস্ত করতে। এই জন্যেই ভাব জমে যায় তাদের।

বাখতিগুল যখন ভেতরে ঢুকল, তখন চারজনেই ঘরে। কাতুবাই বন্দুক সাফ করছে, হরিণের মাংসের কাভার্দাক বানাচ্ছে বৌ, ছেলে বসেছে উনুনের ধার ঘেঁসে, খাবার তৈরির অপেক্ষা করছে। তেপায়ার ওপর ঝোলানো পাত্রে চা ফুটছে।

কাতুবাইয়ের পঞ্চাশ পেরিয়েছে, ছোট্ট দাড়িতে পাক ধরেছে, কিন্তু গালে বাচ্চাদের মতো লাল ছোপ। বেঁটেখাটো, দিলদরিয়া সহজ মানুষ, গিন্নিটিও মোটাসোটা, ভারিক্কী চেহারা, তারও গালে লাল ছোপ। মুখের আকারটা গতরটা তার বেশ বড়োসড়োই, প্রায় মরদের মতো, কিন্তু মনটা সরল উদার, ঠিক একেবারে ষোড়শী কন্যের মতো, মায়াময়ী বুড়ির মতো। সত্যি বড়ো সুখে দুটিকে মিলিয়ে দিয়েছে পিতৃপুরুষদের আত্মা! ছেলেরাও ঠিক মা-বাপের মতোই। দুটি ছেলে, দুটিই ভারি নম্র, ফিটফাট, ভদ্র, বাই-বায়না জেদ নেই কিছু।

যেতেই চা এগিয়ে দেওয়া হল। তারপর মাংস। ফেরারীকে রাত কাটাবার জন্যেও রেখে দেওয়া হল বৈকি... ঠিক যেন আপন ঘরে, আপন জনের হাতের পরিবেশনে পেট ভরালে সে, গরম হয়ে নিল। বাখতিগুলের নিঃসঙ্গ হৃদয়টা নরম হয়ে উঠল, কেঁদে উঠল। নিজের ঘোড়ার কাছে গেল সে, রাত্রির স্তব্ধতায় শান্তভাবে ছানি খাচ্ছে ঘোড়াটা, গলা জড়িয়ে আদর করলে তার, অনেকক্ষণ ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল; বুকের মধ্যে টনটন করছিল তার, কড়া মোচটা দাঁতে কামড়ে রইল সে।

কাতুবাই আর তার বৌ বাখতিগুলের কাহিনীটা জানত, কিন্তু সেটা বাখতিগুলের মুখ থেকেই যতটা শোনা। তার বেশি কিছু তাদের জানা ছিল না। কাতুবাই লোকের বাড়ি যেত না, বিনা কাজে বিনা প্রয়োজনে আউলে আউলে ঘুরত না, গুজবে কান দিত না, নিন্দে কুৎসা না শুনেও তার দিন কাটত। দেখা যাচ্ছে, লোকটার মায়াদয়াও আছে, কত কিছু ধরে দিচ্ছে

ফেরারী চোরকে, ওকে লুকিয়ে রেখে কতটাই না ঝুঁকি নিচ্ছে। সব জানে না বলেই কি কাতুবাই অমন নিশ্চিন্ত? যে জানে না তার কাছে কিসের জিজ্ঞাসাবাদ?

শরতের কয়েকটা কনকনে রাত বাখতিগুল কাটাল কাতুবাইয়ের কাছে। আসত যেত অন্ধকারে, ভালো মানুষদের ক্ষতি যেন না হয়। বেরুত গায়ে তাজা বল নিয়ে, ফিরত খালি হাতে নয়, বুনো শিকার মেরে।

'আমরা নই রে, তুই বরং আমাদের সাহায্য করছিস,' রাতের খাবার পর বলত কাতুবাই, 'জানিস তো, একলা মানুষের খোদা ভরসা!'

বাখতিগুল ভাবত, 'এ লোক যদি আমায় ধরিয়ে দেয় তো তাই সই... ধরিয়ে দিক!'

একদিন সকালের দিকে কাতুবাই উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, 'শুনলাম আমাদের এলাকায় নাকি ভয়ংকর একটা লোক, বদলোক ঘোরাঘুরি করছে। মানুষ নয় — খোদ শয়তান... ভলোস্তের হাকিম হুকুম দিয়েছে ধর্মভয় যাদের আছে তারা যেন ডাকুকে ধরে আটক করে। কিছু দিন আগে নিচের আউলে পুরো একদল সওয়ারী এসে হাজির হয়েছিল তাকে খুঁজতে...' কাতুবাই তার কথা শেষ করলে একটা চাপা রসিকতা করে, 'সে শয়তানটা তুই নস তো ভায়া?'

বাখতিগুল বুঝল চলে যাবার সময় হয়েছে।

সেই মুহূর্তেই সে ঘোড়াকে জিন পরিয়ে রওনা দিলে তালগার ধরে।

দূর থেকেই শোনা যাচ্ছিল ফেনায়িত নদীটার কলকল ধ্বনি। তার কাছেই টগবগ করছে বরফ মেশা জল, দেখে ভয় লাগে। ভয়ংকর ঠাণ্ডায় প্রচণ্ড শক্তিতে ছুটন্ত ধারায় ছলকে উঠছে সবুজ জল — আপনা থেকেই সরে আসতে হয় তীর থেকে, অথচ চোখ যেন ছেড়ে আসতে চায় না! মনে হয় যেন অসংখ্য বোড়া সাপ গা ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করে আছড়ে পড়ছে অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে, পিষে মারছে পরস্পরকে, উগরে তুলছে পাকিয়ে ওঠা ফেনা, তুষার ধবল বুদ্বুদ। মনে হয় যেন তরঙ্গ নয়, হাজার হাজার ক্ষেপে ওঠা জানোয়ার খুরের শব্দে কানে তালা ধরিয়ে আতঙ্কে ছুটে চলেছে স্রোতের খাত ধরে, পিঠগুলো তাদের একাকার হয়ে আছে এক প্রকাণ্ড পিণ্ডে।

সরু একটা খাদের মধ্যে একেবারে ধারেই ঘোড়াটাকে থামিয়ে রাখলে বাখতিগুল, তাকিয়ে দেখতে লাগল, যেন বা নিজেকে সইয়ে নিতে চাইল এই উন্মত্ত জলধারার সঙ্গে। গ্রীষ্মে তালগারের অগাধ জল, কিন্তু এখন এই ভর হেমন্তেও তাতে চড়া পড়ে নি, অযথা কলকল করে চলেছে। স্রোতটা এখানে টানটান ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। ওপর দিকে প্রকাণ্ড একটা উচ্চকিত শিলার পেছন থেকে, যেন একটা পাথুরে নাকের পেছন থেকে, একটা দানবিক পাষাণ মুখগহ্বর থেকে লাফ দিয়ে উঠছে জল, নিচের দিকে তা আছড়ে পড়ছে আমূল ফাঁক হয়ে যাওয়া আরেকটা শিলার ওপর, অতল একটা গহ্বরের মধ্যে। মনে হয় যেন একটা পাহাড় আর একটা পাহাড়কে তৃষ্ণার জল দিচ্ছে কিন্তু তৃষ্ণা আর মেটাতে পারছে না।

বাঁকটা এড়িয়ে বাখতিগুল চলে গেল আরো সমতল একটা জায়গায়, ছোটো একটা খোলা উপত্যকার মতো সেটা। স্রোত এখানে প্রশস্ত, খর বেগ কিছু কম, কিন্তু এখানেও পার হবার কথা ভাবা কঠিন। নিরেট হয়ে, মসৃণ হয়ে পরস্পর মিলে যাওয়া তরঙ্গগুলোর দিকে চাইলে মাথা ঘুরে ওঠে, উঁচু হয়ে ওঠা থকথকে ফেনার বেষ্টনীটা যেন নিথর হয়ে গেছে তাদের শেষহীন যাত্রায়।

'নিচের দিকে আউলের ওখানে সাঁকো আছে,' ভাবল বাখতিগুল। 'এভাবে পার হওয়া যাবে না...'

হঠাৎ মাথা বাড়িয়ে কান খাড়া করলে ঘোড়া। ঘোড়া যেদিকে চেয়েছিল সেদিকে তাকাল বাখতিগুল, বুক তার কেঁপে উঠল।

দুজন সওয়ারী বনহীন ন্যাড়া ঢালটার পেছন থেকে ছুটে আসছে, তীরটা থেকে প্রায় আধ ভার্স্ট দূরে। সাধারণ লোক নয়, চেকপেন পরেছে কেবল বাঁ কাঁধে, ডান হাতে লাঠি। ঘোড়াগুলোও তাজা, চাঙ্গা।

বাখতিগুল চট করে তাকিয়ে দেখল পেছন দিকে, পাথুরে পাহাড়টার ওপর আরো চারজন সওয়ারী, তাদের একজনের হাতে বোধ হয় বন্দুকও আছে।

এই ব্যাপার তাহলে। প্রায় ঘেরাও অবস্থা। পাথুরে ফাঁদে পড়েছে সে। নির্জন দুর্গম অঞ্চলে উধাও হয়ে যাবার পথ আটকে রেখেছে ফেনায়িত সশব্দে ধাবিত তালগার।

কোথাও লুকোবার নেই। সোজা ছুটে বেরিয়ে যাবে? উহুঁ, খাটবে না। মোটেই ছেড়ে দেবার লোক নয় ওরা। না পারলে অন্তত গুলি করবে।

ভাববারও সময় নেই। সওয়ারীরা দেখতে পেয়েছিল তাকে, হিংস্র মুখ ব্যাদান করে লাঠি উঁচিয়ে ঘোড়া ছুটাল তারা। সামনে তিন জন, পেছনে ছয়-সাত জন, গোনবারও অবকাশ নেই। তালগারের গর্জন ছিঁড়ে বেজে উঠল দীর্ঘ শিস।

শুধু একটা পথ, একটা আশা...

প্রায় না ভেবেচিন্তেই বাখতিগুল পিঠের বন্দুকটা টান করে বাঁধলে, বুকের কাছে গুলিভরা চামড়ার থলিটা পরখ করলে, পকেটে নিল ছয়ঘুরী পিস্তলটা। চোখ আন্দাজে তীরের একটা শান্তমতো জায়গা বেছে চাবুক কষলে ঘোড়া সাভরাসির গায়ে, হাঁকালে সোজা জলের মধ্যে।

সাভরাসি এগুল, ঘাড় নিচু করলে সে, যেন জল খেতে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে সাবধানে নেমে পড়ল তুহিন খরস্রোতে।

তীরের কাছেই জল উঠল ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত। তারপরে আরো গভীরে নামল ঘোড়া, পেট পর্যন্ত জল উঠল, গুঁত্তা খেয়ে টাল হয়ে চলতে লাগল ঘোড়া। তীর পাহাড় আকাশ — সবকিছুই যেন এক প্রকাণ্ড লাল-কালো-সবুজ নাগরদোলায় ঘুরতে লাগল তার চোখের সামনে।

'পার করে দাও খোদা... . পিতৃপুরুষেরা বাঁচাও এ যাত্রা...' সাভরাসির পিঠ আঁকড়ে প্রার্থনা করলে বাখতিগুল।

জোরালো স্রোতের ধাক্কায় ঘোড়া সওয়ারী দুজনেই কখনো ওপরে ওঠে কখনো নিচে নামে, ভেসে যায় নদীর ধারায়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেবলি জলের ধাক্কা খেতে লাগল বাখতিগুল, যেন হাজার হাজার লাঠি পড়ছে তার গায়ে,

হাজার হাজার আংটা দিয়ে তাকে টেনে ফেলতে চাইছে ঘোড়া থেকে। প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়া আঁকড়ে রইল বাখতিগ্নল, বেশ টের পাচ্ছিল কি ভাবে প্রাণপণে লড়ছে ঘোড়া, কি ভাবে জলের তলের পাথরগ্নলোর ঝাপটা খাচ্ছে সে, তব্ন হাল ছাড়ে নি, সওয়ারীকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। এ ঘোড়া যদি জেরবার হয়ে পড়ে, তবে সব শেষ! ওর ব্নক, পা কি এখনো অক্ষত আছে? কোনটাই বা ডান তীর, কোনটা বাঁ? কিছ্ন আর ঠাহর হচ্ছে না বাখতিগ্নলের... সামনে তার হাঁ করে আছে কেবল সবজেটে জলের গ্রাস, উল্টে পালটে সেই জলস্রোতে ভেসে চলল সে, বেশ টের পাচ্ছিল চলছে সে ধ্বংসের ম্নখে। শেষ মাত্রা পর্যন্ত মোচড় খাওয়া তার ব্নকটায় আশা আর কিছ্ন ছিল না।

ম্নহ্নর্তের জন্যে জলের ওপর ব্নক পর্যন্ত ঠেলে উঠল ঘোড়াটা, বাখতিগ্নলের চোখে পড়ল সামনেই একটা কালো সিক্ত শিলাস্ত্নপ উঁচু হয়ে আছে। মাথার মধ্যে তার ঝলক দিয়ে গেল, 'খতম!..' ম্নহ্নর্তের মধ্যে স্রোতের টানে তারা আছড়ে পড়বে ওখানে, দিগ্বিদিকে ছিটকে যাবে... কিন্তু তার কোনোটাই ঘটল না। কি এক আশ্চর্য উপায়ে কালো শিলাস্ত্নপটার কাছে ঘোড়াটা আটকে গেল, এমন কি পায়ের ওপরেও দাঁড়ালে, চারিদিকে তাকিয়ে গলা খাঁকারি দিলে বাখতিগ্নল, থ্নতু ফেললে। হাই খোদা! তীর যে মাত্র দ্নই তিন পা...

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টের পেল পেছল শিলাটায় কি ভাবে পা ফসকাচ্ছে সাভরাসির। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলে ঘোড়া, জ্বলন্ত চোখে

চেয়ে হলুদ দাঁত খিঁচল। এক্ষুণি জলের তোড় এসে ডুবিয়ে দেবে তাদের। উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠল বাখতিগুল, হয়ত বা বললে বিদায়, হয়ত বা বললে মাপ করিস। ঘোড়ার পিঠের ওপর উঠে দাঁড়াল সে, তারপর দুই কানের মাঝখানে মাথার খুলিতে পা দিয়ে মরীয়া হয়ে লাফ দিলে তীরের দিকে...

পায়ে তার জলের বাড়ি পড়ল ঠিক যেন লাঠির বাড়ি। ভাবল, 'সব শেষ!'

জ্ঞান তার যখন ফিরল তখন সে তীরের ঢালুতে উপুড় হয়ে পড়ে, মুখটা রক্তাক্ত, ছেঁড়া পোষাক, শীতে আর যন্ত্রণায় কাঁপছে। প্রথম কথাটাই তার মনে পড়ল, 'সাভরাসি...' ককিয়ে উঠে মাথা তুললে বাখতিগুল, কিন্তু চোখের ওপর লেপটে যাওয়া রক্তাভ কুয়াসায় কিছুই তার নজরে পড়ল না।

ডান পাশটা, ডান উরুটা ক্ষতবিক্ষত, যেন জানোয়ারে থাবা বসিয়েছে। গোটা দেহে আঁচড় আর রক্ত। কিন্তু হাড়গোড় ভাঙে নি, মাথাটাও অটুট। বন্দুক আর গুলির থলেটাও ঠিক আছে, শুধু পকেটের সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটাও উধাও হয়েছে।

অন্ধের মতো যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে বাখতিগুল তীরের ওপর দিকে উঠল, তারপর চোখ থেকে রক্তের কুয়াসাটা কাটতেই তালগারের দিকে তাকিয়ে রইল ক্ষেপার মতো। ক্ষমতা থাকলে হাহাকার করে কেঁদে উঠত সে। সাভরাসির চিহ্ন নেই কোথাও। শুধু তাকে উপহাস করার জন্যেই যেন হাতে চাবুকটা এখনো থেকে গেছে।

না, ঘোড়ার পিঠে মৃত্যু তার কপালে নেই... নেই সাভরাসি! হলুদ ঠোঁট নির্ভীক দোস্ত তার সেই জগতেই গেছে যেখান থেকে কেউ ফেরে না...

দাঁত কড়মড় করে রাগে বাখতিগুল তাকিয়ে দেখল অপর পারে।

স্রোত থেকে বেশ কিছু দূরে ছটফটে ঘোড়ার ওপর জন পনের সওয়ারী। জলের দিকে এগুতে চাইছে না তারা। যে দৃশ্য দেখেছে তাতে ঘোড়া সওয়ারী সবাই কেমন ভয় খেয়ে গেছে। তালগার পেরিয়ে গেল শয়তানটা!

বাখতিগুল তখন তার রক্তাক্ত মুঠিটা তুলে অল্প নাড়িয়ে ভাঙা গলায় বললে:

'সবুর করো হে মেহেরবান বাই...'

৯

কারাশ-কারাশ গিরিদ্বারের জনহীন কঠোর অঞ্চলটায় ঘুরছে বাখতিগুল। রাতে সে লুকিয়ে থাকে পাইন বনে, কাঁটা ঝোপের মধ্যে পাথরের গর্তে ধিকি ধিকি ধোঁয়াটে আগুন জেবলে চায়ের জল গরম করে, সেদ্ধ করার কিছু থাকলে সেদ্ধ করে। আর সূর্য উঠলেই নেমে আসে গিরিদ্বারে, শূন্য বিষণ্ণ পাহাড় বরাবর ধূসর ফিতের মতো পথটায়।

দিনের পর দিন বাখতিগুল তার কালো মোচ কামড়ে জবালা-জবালা চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকত পথটার দিকে, মাঝে মাঝে নেমে আসত, সতর্কে চারিদিকে চেয়ে হাঁটাহাঁটি করত,

কি যেন খ‍ুঁজত সে। কখনো বা আবার উব‍ু হয়ে বসে থাকত রাস্তাটার এপাশে বা ওপাশে, শ‍ুয়ে থাকত উপ‍ুড় হয়ে, বিষণ্ণ ভাবনায় ডুবে থাকত, আপন মনে অস্পষ্ট কি সব বিড়বিড় করত, আর তাকিয়ে থাকত রাস্তাটার দিকে, তাকিয়ে থাকত পাখির মতো এক চোখ ব‍ুঁজে, যেন চোখ মারছে কাকে।

ম‍ুখখানা বাখতিগ‍ুলের ধ‍ূসর, গালে কোনো রক্তের আভাস নেই, মনে হয় যেন জীবনের সব রস তার শ‍ুকিয়ে গেছে। হাত তার কাঁপত, চমকে উঠত, গিঁটগিঁট বাঁকাচোরা আঙ‍ুলগ‍ুলো দিয়ে কি যেন ধরতে চাইত সে। নিঃশ্বাস ফেলত এলোমেলো, কখনো যেন সমস্ত ব‍ুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ত, কখনো বা আবার কেশে কেশে উঠত ভাঙা ভাঙা অস্থির গলায়।

অধৈর্যে জ্বলছিল সে। জ্বরতপ্ত ঠোঁট থেকে তার ঝুলন্ত লম্বা মোচ জোড়া মনে হত যেন বরফে শেয়াল চেপে ধরা ঈগলের ডানার মতো।

দিনের পর দিন সে গিরিম‍ুখটা দিয়ে নেমে আসত পথে। পথটা দেখার পর মাথা তুলত উঁচু 'আসা' পাহাড়ের ওপর চারণ মাঠটার দিকে, হেমন্তে তা শ‍ুকিয়ে এসেছে, প্রথম তুষারপাতে ঢেকে গেছে শাদায়। বরফের ঝলকে তার লালচে চোখ কুঁচকে তাকাত বাখতিগ‍ুল, বোঝা যেত না সে চোখে জল টলমল করছে নাকি অমনি চিকচিক করছে ঠাণ্ডায়।

খোদা সাক্ষী, এ ইচ্ছা তার ছিল না, এ সে করতে চায় নি, যেমন চায় নি হৈচৈ তোলা বীরযোগ্য বারিমতা, যেমন চায় নি যশোহীন গোপন ঘোড়া চুরি। চরমে ঠেলে দেওয়া হয়েছে ওকে,

তালগারে সেদিন পাড়ি দিতে গিয়ে সে মরণ আলিঙ্গনেও দ্বিধা করে নি। বেঁচে ওঠা তার কপালে ছিল। নিজের পেয়ালা তার এখনো নিঃশেষ হয় নি। তার শেষটুকু এখানে এই কারাশ-কারাশে পান করার জন্যে সে তৈরি হচ্ছিল।

কারাশ-কারাশ হল ন্যাড়া ন্যাড়া পাথুরে তিনটে পাহাড়ের জটলা — পাইন আর ফার বনের মেখলা তাদের কোমরে। বড়ো কারাশ, মেজো কারাশ আর ছোটো কারাশ... কালো কালো পাহাড়, স্লেটরঙা বিষণ্ন সব শিলা, বুনো ঝোপঝাড়ের রঙও কেমন চিরকেলে কালো... এখানকার গিরিপথটা খুব উঁচুতে, যাত্রায় কষ্ট অনেক, কিন্তু সারা এলাকায় এইটেই একমাত্র পথ। গ্রীষ্মে এখান দিয়েই ধীর পদক্ষেপে ক্যারাভানের পর ক্যারাভান যায় বুর্গেনে, চেলকারে; ডাক ছেড়ে হ্রেষা তুলে পালের পর পাল যায় ওপর দিকে জাইলিয়াউর সতেজ ঘাসের জন্যে। এখন ধূসর হেমন্ত, বরফ ঝড় আর শ্বেত হিমবাহ শিগগিরই শুরু হবে, পথচারী এখন দেখা যায় কম, ঘোড়াকে তাড়া দিতে দিতে তারা নজর রাখে পেছন পেছন নেকড়েরাও সমতলভূমিতে নেমে আসছে কিনা।

একলা বাখতিগুলই কেবল এখান থেকে গেল না। সে জানত এইখানেই তার ভাগ্য। অপেক্ষা করে রইল সে রাস্তার দিকে চেয়ে।

ডেরা পাতলে সে মেজো কারাশে। চারপাশের সবকিছু অন্নতন্ন করে দেখল সে, প্রতিটি খাদ, প্রতিটি ফাটল সে যাচাই করল, কুকুরের মতো শুঁকে শুঁকে দেখল পাহাড়টা, মোল্লার পুঁথির মতো এ পাহাড়ের সবকিছু তার মুখস্থ। এমন একটা

জায়গা খ‍ুঁজছিল সে যেখানে আচমকা ঠিক যেন ভুঁই ফুঁড়ে আবির্ভূত হওয়া যায় আবার সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়ে যাওয়া যায় মাটির তলে। তেমন জায়গা একটা পাওয়াও গেল।

পথটা গেছে পাথ‍ুরে ঢাল বেয়ে মস্ত একটা গোল বাঁক নিয়ে, ফলে দ‍ূর থেকেই পথচারীকে দেখা যায়। গিরিসংকটটার কাছে পথটা গেছে পাহাড়ে দেয়াল বরাবর একেবারে খাদের ধার ঘেঁসে। এখানে ম‍ুখোম‍ুখি দ‍ুজন লোকের পেরন কঠিন, পরস্পরকে ধরে পেরতে হয়। রাস্তার উল্টো দিকে গড়ানে জায়গাটার অন্য পারে একটা ছ‍ুঁচলো টিলার ওপর ঘেঁসাঘেঁসি করে আছে তিনটে প‍ুরনো অ্যাস্প গাছ — এমন ঘেঁসাঘেঁসি যে মনে হয় যেন একই শিকড় থেকে গজিয়েছে। আর ঠিক এই গাছগ‍ুলোর পরেই একেবারে খাড়াই গা, লাল পাথরের জড়‍ুলে ঢাকা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব কেবল ছাগলের পক্ষে। তার তলে ঘন কালো অরণ্য, পথচারী সওয়ারী যে কেউ সেখানে সহজে গা ঢাকা দিতে পারে।

ভোরের বেলা গিরিসংকটটার কাছে এসে খাড়াইয়ের ওপরকার এই অ্যাস্প গাছগ‍ুলোর র‍ুক্ষ র‍ূপোলী গায়ে অনেকক্ষণ ধরে আদর করে তার কড়া কড়া হাতে হাত ব‍ুলল বাখতিগ‍ুল।

যে দ‍ুনিয়ায় সে ছিল তার কথা সে ভাবছিল আফশোস নিয়ে, নৈরাশ্য নিয়ে। হেমন্তের আকাশ ভরে মলিন ধ‍ূসর আভাস। দ‍ূরের শ্বেত শিখরগ‍ুলো মেঘের পাগড়িতে ঢাকা। পাহাড়ের পাথ‍ুরে দেহে কেমন একটা গম্ভীর ছায়া, এমনি

দ্পুরের আলোতেও চুড়োগ্লো যেন তাদের লোমশ ভুর্ কুঁচকে আছে, মেজাজ যেন তাদের খারাপ। চারিদিকে কবরের স্তব্ধতা। নীল মেঘ ফুঁড়ে আসা সকালের আলোয় অ্যাস্প গাছগ্লোর সামনের রাস্তাটা গাঢ় লাল হয়ে উঠেছে, মনে হয় যেন রক্তাক্ত। চারপাশের শিলাগ্লোর মধ্যেও ঝিকমিক করছে লাল ছোপ।

'তবে তাই হোক...' ফিসফিস করলে বাখতিগ্ল, মোচটা কামড়াল।

মাঝে মাঝে সে গিরিসংকটটা থেকে উঠে যেত পাহাড়ের উঁচুতে। ব্ক ভরে নিঃশ্বাস নিতে চাইত, নামাতে চাইত ব্কের মর্মান্তিক চাপটা।

অনেক দ্রে দক্ষিণে, রোদের দিকটায় দেখা যায় সারিমসাক্তির পাইন বন। এখান থেকে মনে হয় যেন কালো রঙের একটা প্রকাণ্ড ঘোড়ার পিঠ। এই বনেই, ব্নো রশ্নের মতো ঝাঁঝালো এই বনটাতেই বাখতিগ্ল একদিন তার প্রাক্তন মনিবের পাল থেকে চুরি করা ঘ্ড়িটাকে ল্কিয়ে রেখেছিল, এত খিদে পেয়েছিল তার যে সে গন্ধে পেট ঘ্লিয়ে উঠেছিল... মাত্র একবছর আগের কথা! জীবনের শেষ বছর, প্রথমে যা তার কাছে মনে হয়েছিল অসম্ভব লঘ্, অসাধারণ পরিতৃপ্তির জীবন...

গিরিসংকটের অন্য দিকটায় হিমেল বাতাসের পথ আড়াল করে উঠেছে নাজার পাহাড়। তার নিলচে কুঁজটা ফুলে ফুলে উঠেছে ঘর্মাক্ত নফরের হাতের শিরার মতো। এই টিলাটাতেও গায়ে গা লাগিয়ে মাথা তুলেছে লালচে-হল্দ পাইন, কালচে-

সবুজ ফার। মাঝে মাঝে চুড়োগুলো তাদের ভাঙা। শিলাবৃষ্টিতে ভাঙাচোরা তাদের ডালপালা আর বেরিয়ে আসা শিকড় সমেত প্রকাণ্ড বাদামী কাণ্ড দেখে মনে হয় যেন প্রাচীন কালের এক বীরের কঙ্কাল। পড়ে আছে, ক্ষয় পাচ্ছে, তার তলায় আর কিছুই জন্মায় না।

আর ওপর দিকে, পাহাড়গুলো ছাড়িয়ে মেঘ ছাড়িয়ে ঝলক দিচ্ছে ওজার পর্বতের চিরকেলে অপাপবিদ্ধ তুষার। মাথাটা শাদা চুলো বুড়োর মতো কিন্তু নামটা ওজার — অর্থাৎ উদ্ধত। রাতের আকাশেও ধবধব করে তার মাথা আর বাখতিগুলের এখন মনে হল যেন তাকে হাতছানি দিচ্ছে, তার মহাকায় উদ্দামতায় ডাকছে সেইখানে, দিকচক্রবালের দুরন্ত যে শিখরে মায়া নেই, সবকিছু যেখানে কঠিন তুহিন।

হ্যাঁ, এই মেঘ ছাড়িয়ে যাওয়া তুষার-ঢাকা মাথা যেন কথা কইছিল বাখতিগুলের সঙ্গে, তার ভাবনাই ভাবছিল, যেন বা টের পাচ্ছিল কি ঘটছে নিঃসঙ্গ তাড়িত মানুষটার কলজের মধ্যে, পিতৃপুরুষের ভিটের জমিতে বাস করা যার হয়ে উঠল না।

দিনটা বেশ গরম, বাতাস ছিল না। গিরিসংকটে দাঁড়িয়ে ছিল বাখতিগুল, নীরবে কথা কইছিল শ্বেতশির ওজারের সঙ্গে, হঠাৎ কেন জানি মাথা ফেরালে। সাবধানে পাথরের তলে গুড়ি দিয়ে দাঁড়াল সে, চঞ্চল হয়ে তাকাতে লাগল চারিদিকে... দেখা গেল দূরে মেজো কারাশের ম্যাড়মেড়ে গা ঘেঁসে রাস্তার ওপর এক দল সওয়ারীর কালো মূর্তি।

তারা আসছে 'আসা' পাহাড়ের দিক থেকে, আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে ঢালটার অন্ধকার ছায়ায়, ডুবে যাচ্ছে যেন।

অনুচ্চে চেঁচিয়ে উঠল বার্থতিগুল, তারপর গুড়ি মেরে খড়খড়ে নুড়ি পাথরগুলোর ওপর দিয়ে ছুটে গেল সেই তিনটে বুড়ো অ্যাস্প গাছের দিকে।

তাদের নীলচে গুঁড়ির পেছনে লুকিয়ে রইল সে, ঠান্ডা ঘামে ভিজে গেল তার সারা দেহ। সঙ্গে সঙ্গেই সে তাকাল ওজারের দিকে। শাদা চোখ-ধাঁধানো উদ্ধত মাথাটা সোজা তাকাল তারই মুখের দিকে, ঠিক যেন তার হাজার হাজার জ্বলজ্বলে দুরন্ত চোখ দিয়ে উল্লাস ছড়িয়ে।

বুকে হাত দিল বার্থতিগুল, বুক থেকে যেন হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে আসছে, কানের মধ্যে যেন ঘণ্টা বাজতে লাগল। চোখ কুঁচকে ও তাকিয়ে দেখল নাজার টিলার বনটার দিকে, মনে হল যেন কাঁটা কাঁটা ফার গাছগুলো জায়গা ছেড়ে দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চলেছে কুঁজো টিলাটার ওপর দিকে, ঠিক যেন ঝঞ্ঝা আক্রমণে নেমেছে এক বাহিনী, শেষ হামলায় এগিয়েছে... কিন্তু পরের মুহূর্তে অন্য একটা কথা মনে হল তার: ওখানে উপরে সৈন্য নয়... পাইন আর ফার গাছগুলো যেন মানুষের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ডালপালার হাত গুটিয়ে ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে তার কাছ থেকে, সে যা করতে চাইছে সেই ভয়ানক কান্ডটা থেকে।

জ্বালা-জ্বালা চোখে হাত বুলোলে বার্থতিগুল, অশান্ত হৃৎপিন্ডটা শান্ত করার জন্যে মাটিতে বুক পেতে শুল, যন্ত্রণায় বিকৃত, ঘামে ভেজা মুখটা রাখলে মাটির ওপর। চুপ করে রইল মাটি, আর সে মাটি বেয়ে দূর থেকে ভেসে এল চাপা খুরের শব্দ।

কষ্ট করে অসুস্থের মতো মাথা তুলল বার্থতিগুল। গাছের ঠিক প্রায় গুঁড়িগুলোর তল থেকেই পাহাড়ে জল নামার গভীর কয়েকটা খাত নেমে গেছে সোজা নিচে। দেখে মনে হয় যেন বলিরেখা, নোংরা আঁকাবাঁকা ধারা চুইয়ে আসছে তা থেকে, ঠিক যেন চোখের জলের দাগ।

না, এ রাস্তা ওদের পেরতে হচ্ছে না! দাঁতে দাঁত চাপায় প্রায় যন্ত্রণা করে উঠল বার্থতিগুলের।

'যা হবার তাই হোক,' ধীরে ধীরে প্রায় মন্ত্রের মতো কথাটা উচ্চারণ করলে সে, ডান হাতের তল থেকে এগিয়ে দিল বন্দুকের লম্বা নলটা।

স্বচ্ছ রেশমী ঝালরের মতো নীলাভ মরীচিকার মধ্যে রাস্তার সরু বাঁকাটায় দেখা গেল সওয়ারীদের, সংখ্যায় জন পনের।

এরা রাখালও নয়, পেয়াদাও নয়, পয়সাওয়ালা লোক। অধিকাংশেরই দৌড়বাজ ঘোড়া, বাছাই করা, সবকটিই এক রঙের — উজ্জ্বল বাদামী। জিন লাগাম বেশ দামী, দূর থেকেই মৃদু ঝলক দিচ্ছে রূপো। চলছে বাবুরা, তাড়াহুড়ো নেই, যেন উৎসবের যাত্রা। মাঝখানে সবচেয়ে ভারিক্কীরা, সামনে পেছনে মামুলীগুলো। মেয়েদের গায়ে সাজের ঘটা, যেন এক মস্ত পরবে চলেছে। কালো পাথরের প্রেক্ষাপটে চোখে ধাক্কা মারে রামধনু রঙা শাল, ফুঁয়ো ফুঁয়ো ঝালর, আর তুষারের মতো শাদা ধবধবে কাপড়ের প্রান্তদেশ। সবাই ভারি হাসিখুশি, নিশ্চিন্ত। দূর থেকে ভেসে আসছে তাজা গলার আলাপ, তরল হাসি। রাস্তাটা যেখানে চওড়া সেখানে চলছে দু-তিন জন করে

সার বেঁধে, যেখানে সরু সেখানে একজনের পর আরেক জন, হাঁসের পালের মতো। হাঁকাহাঁকি করছে পরস্পরকে, মাথা ঘুরিয়ে কথা কইছে, সজোরে হেসে লুটিয়ে পড়ছে জিনের ওপর। গণ্যিমান্যি ফূর্তিবাজ পয়সাওয়ালাদের দল একটা!

চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে বাখতিগুল এদের মধ্যে খুঁজছিল শুধু একজনকে। আর তাকে সত্যিই চিনতে পেরে মৃদু ককিয়ে উঠল সে! হ্যাঁ সেই, নিটোল দেহ, গম্ভীর চাল, উদার হৃদয়, উঁচু ফরসা কপাল। সোনালী-বাদামী ঘোড়াটাও অতি চেনা, শাদা কেশর, শাদাটে লেজ, পায়ে শাদা গুটি। তেল চকচকে ঘোড়া ঝলমল করছে চর্বিতে, আগুনের মতো খাঁটি সোনা ঝরছে গা থেকে। এই ঘোড়ায় চেপেই বাখতিগুল বারিমতায় সর্দারি করেছিল... ইস কি ঘোড়া! আর কি তার সওয়ার! মেয়েরা দল বেঁধে চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে, কাছে আসছে, রগড় করছে, হাসাচ্ছে আর নিজেরাও হেসে উঠছে লীলা ভরে। বোঝা যাচ্ছে, খুবই আমোদে আছে।

হঠাৎ কেমন একটা কনকনে কাঁপুনি ধরলে বাখতিগুলের। বন্দুকের মাছিটা নড়তে লাগল। অসম্ভব হয়ে উঠল নিশানা করা।

বাখতিগুল তখন ফের তাকাল ওজারের দিকে... সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে মিলিয়ে গেল কাঁপুনি। মাথা থেকে মেঘের পাগড়ি খসিয়ে ফেলেছে ওজার, চাঁদি থেকে কাঁধ পর্যন্ত শাদা মাথাটা তার ঝকঝক করছে গর্বে, মহত্বে। এর মধ্যেই কী এক আদেশ শুনলে বাখতিগুল। সম্ভবত ওখানে ওই উঁচুতে এখন

শনশনিয়ে উঠছে দুরন্ত, ডাকাতে বাতাস, তালগারের স্রোতের মতো প্রবল। যেন সেই ঝড়ের স্তুতিতেই গর্জন করে উঠল বাখতিগুল, আঁকড়ে ধরল তার পুরনো ভারি বন্দুকটা।

পাহাড়ের শাদা-কালো পাথুরে গা ঘেঁসে পথটা যেখানে গেছে খাদটার কাছ দিয়ে, সেখানে লম্বা হয়ে গেল হাসিখুশি আমুদে মিছিলটি। গিরিসংকটটায় ঠিক তার পাঁজরটার কাছেই ছিল কতকগুলো কার‍্যান্ট গাছের ঝোপ। তার পাকা-পাকা রসালো ফলগুলো ঠিক কারাশ-কারাশ শিলার মতোই কালো। ঝোপটার কাছে এলেই আরোহীরা একের পর এক নিচু হয়ে কালো ফলগুলো পরখ করছিল। শুধু সোনালী ঘোড়ার আরোহী হাত বাড়ালে না। কিন্তু ঝোপগুলোর কাছ দিয়ে জমকালো ভঙ্গিতে যতক্ষণ সে এগচ্ছিল ততক্ষণে বাখতিগুলের হাত ঠিক হয়ে গেছে, নিশানার মধ্যে ধরেছে তাকে।

অপেক্ষা করছিল সুপুরুষ বাই কখন মুখ ফেরাবে তার দিকে।

পাথরের ওপর নাল মারা খুরের শব্দ উঠছিল খটখট। ক্রমেই কাছিয়ে আসছে তারা। গোল পথটা এবার ফিরেছে অ্যাস্প গাছ তিনটের দিকে। বাখতিগুলের চোখের সামনে লাফিয়ে উঠল উজ্জ্বল ছাই রঙের একটি ঘোড়ার পা, তার পেছনে দেখা দিল শ্বেতকেশরী শ্বেতপুচ্ছ ঘোড়াটা। গম্ভীর চালে যাচ্ছে সে, উঁচু করে রেখেছে তার সোনালী মাথাটা, আশ্চর্য একটা মসৃণ লঘুতায় সামনের পা তুলছে, ভেসে চলেছে যেন। বাইয়ের পেছনে দেখা গেল শাল জড়ানো ছোট্ট এক তরুণীর মূর্তি। এ নিশ্চয় দোসাই বংশের কালিশ,

জারাসবাইয়ের দ্বিতীয় বৌ, নির্বাচনের হৈচৈয়ের মধ্যেই যাকে বিয়ে করেছে জারাসবাই। সুখী স্বামী তাকে নিয়ে আসছে নিজের আউলে।

'থাম!.. থাম!..' নিজেকে বললে বার্খাতিগুল। এক গুলিতেই দুজনের জান নেওয়া এখন খুবই সহজ। সওয়ারী বরং আর একটু সামনে এগুক।

সুপুরুষ বাই, তৃপ্তিতে হাত বুলাচ্ছে গোছগাছ দাড়িতে, তাকিয়ে দেখছে ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে, এই সময় শেষ পর্যন্ত ভারি আলগোছে নরম হাতে ঘোড়া টিপল বার্খাতিগুল। নীলাভ কাপড়ের শেয়ালে ফার কোটটির যে জায়গাটা তাক করেছিল বার্খাতিগুল সেখানে ফুটে উঠল ছেঁড়াখোঁড়া এক ছিদ্র, তার ওপর স্বচ্ছ নীলাভ ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী। চমকে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা আর চিৎ হয়ে পড়ল সওয়ারী, রুপো বাঁধানো জিন থেকে উলটে পড়ল, হাট হয়ে খুলে গেল তার ওভারকোট।

অজান্তেই লাফিয়ে উঠল বার্খাতিগুল, তাকিয়ে দেখলে কি ভাবে উলটে পড়ছে বাই। তাকিয়ে দেখলে বাইয়ের অনুচররাও, থমকে গেছে সবাই, চকিত ঘোড়াগুলোকে বাগ মানানোই কঠিন হয়ে পড়েছে।

বার্খাতিগুল ততক্ষণ অ্যাস্প গাছগুলোর পেছনকার খাড়াই ঢালু দিয়ে নামতে শুরু করেছে, ছাগলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে লাল পাথরের খোঁচাগুলোয়, পেছনে ওদিকে নববধূ কালিশের মর্মভেদী কান্না ডুকরে উঠল:

'ওগো বাই... বার্খাতিগুল!'

কেঁপে উঠল সে, মাটিতে নেমে পেছন দিকে একবারও দৃকপাত না করে ছুটে গেল বনটায়।

সন্ধ্যার দিকে বাখতিগুল কারাশ-কারাশের ধারে কাছেও ছিল না বটে, কিন্তু হৃৎপিণ্ড তার আগের মতোই ঢিপঢিপ শব্দ করে চলল। কম্পজ্বরের মতো একটা উত্তেজনা লেগেই রইল তার। ঠাণ্ডা না থাকলেও বার বার তার কাঁপুনি ধরছিল।

সন্ধ্যার নীলাভ আবছায় তার সঙ্গে দেখা হল এক অচেনা শিকারীর। বুনো ছাগলের লাস বাঁধা তার জিনের সঙ্গে। বাখতিগুল হাঁক দিয়ে থামালে তাকে, শিকারটা দেখলে, তারপর একটা তিক্ত বাঁকা হাসি হেসে বললে:

'আমিও আজ ছাগল মেরেছি একটা...'

১০

কয়েদখানায় বাখতিগুল।

বেঁচে আছে সে, নিঃশ্বাস নিচ্ছে, কথা কইছে, কিন্তু বোঝা যায় না কি করে সে টিকে রইল, কি করে দেহে প্রাণ রয়ে গেল তার।

কারাশ-কারাশে গুলির পর জারাসবাইয়ের জ্ঞাতিরা সমস্ত জানিস বংশকে উত্তেজিত করে তুলল। সদরের সরকারী দপ্তর তাদের সাহায্যের জন্যে পাঠাল সশস্ত্র পুলিস অফিসার। কিন্তু জন্মস্থান ছেড়ে কোথাও পালানর ইচ্ছে হল না বাখতিগুলের, এমন কি অন্য উয়েজদেও গেল না। ধরা পড়ল সে।

সারি'দের ছোট্ট গরিব বংশটা বসত পেতেছিল যে জায়গাটায় সে জায়গাটা ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিলে সর্বশক্তিমান জানিস বংশ। সর্বসমেত ছিল তো মাত্র খান কুড়ি ভিটে... সারি'দের দীনহীন সম্পত্তি যা কিছু ছিল সব লুটপাট করে নিয়ে যায় জানিসরা, ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা ঝুলকালি পড়া কশমাগুলোও বাদ দিলে না। লুট করলে একেবারে নিঃশেষ করে। ছারখার করলে একেবারে সম্পূর্ণ করে, ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সমেত ভাগিয়ে দিলে তাদের চিরকালের বুর্গেন আর চেলকার থেকে। ছেলেমেয়ে সমেত হাতশাকেও দীন দুনিয়ায় দূর করে দেয় তারা।

নতুন বিচার হবে বাখতিগুলের, সদরের বিচার, রুশী কাজীদের রায়।

শহরের একজন সমৃদ্ধ বিচারকের বাড়িতে চাকরানীর কাজ করত হাতশা। ছেলেমেয়ে নিয়ে উপোস করেই অবশ্য কাটত তার। নিজের ভাগটা বেঁটে দিতে হত চার জনকে...

একদিন সুযোগ বুঝে বাখতিগুল জেলের বড়ো কর্তার পা জড়িয়ে ধরে। কয়েকদিন পরেই দুয়োর খুলল। জেলখানার অন্ধকূপের মধ্যে এসে দাঁড়াল সৈয়দ!

জেলখানাতেই রয়ে গেল ছেলেটা।

শান্ত, চুপচাপ ছেলেটা, কি যেন ভাবে, কয়েদীদের সকলেরই ভারি পছন্দ হল, রুশী কাজাখ সব কয়েদীই তাকে খাওয়াত, নিজের নিজের খাবারের খানিকটা ভাগ দিত। তা দেখে বাখতিগুলের বুক কেমন করে উঠত।

বাখতিগুলের পড়শী কয়েদী আফানাসি ফেদোতিচ বইপত্র জোগাড় করলে কোথা থেকে, নিজের পয়সায় পেনসিল কিনলে, খোপ খোপ লাইন-টানা কাগজ কিনলে, জুনুস মোল্লার মতোই লেখা পড়া শেখাতে লাগল সৈয়দকে। দেখে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠত বাখতিগুলের।

সৈয়দের ঘুম হত না ভালো, ঘুমের মধ্যেই জোরে জোরে রেগে কি সব যেন বলত, কান্নায় ঘুম ভেঙে যেত তার। রাতের বেলায় লাফিয়ে উঠত, চেঁচাত অস্ফুট গলায়, আর তন্দ্রার চোখে পাগলার মতো চেয়ে থাকত গরাদে দেওয়া জানলা দিয়ে চাঁদনী আলোর দিকে, যেন ভেবে পেত না ইয়ুর্তায় জানলা এল কোথা থেকে... আবার দিনের বেলায় এক এক সময় বসে থাকত চুপচাপ, জেলের রুটি চিবত আর দুই গাল বেয়ে নামত হলদেটে যবদানার মতো দু ফোঁটা অশ্রু।

ছেলেটা দেখেছিল কী ভাবে তাদের শীতের ভিটের কাছে ধরা পড়ে তাদের বাপ — বারিমতার সেই দুর্দান্ত সর্দার, যাকে কেউ কোনো দিন ধরতে পারে নি।

সৈয়দ ছটফট করেছিল তার মায়ের কোলে, আর প্রাণপণে তাকে আঁকড়ে হাতশা ককিয়ে উঠেছিল:

'হায়রে পোড়া কপাল, ওরে তোর বাপকে মেরে ফেলবে রে, পোড়া কপাল আমার!'

আর এখন জেলের পাথুরে গহ্বরের মধ্যেও ছেলেটা ওই একই দৃশ্য দেখত: লাঠি, চাবুক, কিলঘুষি, বুটজুতো... একই দৃশ্য দেখত সে স্বপ্নে, ছটফট করত মায়ের কোলে...

বাখ্‌তিগ্‌ল আদর করত না ছেলেকে, সান্ত্বনা দিত না, শ্‌ধ্‌ মাঝে মাঝে যখন সে খ্‌বই বেশি জোরেই খে'কিয়ে উঠত ঘ্‌মের মধ্যে তখন জাগিয়ে দিত তাকে।

কিন্তু একদিন খ্‌ব ভোরে, সকলে ঘ্‌ম্‌চ্ছে, সৈয়দ উঠে পায়চারি করছে, বাপ তাকে নরম গলায় ডাকলে:

'সৈয়দজান, আয় শোন বেটা...' ছেলেটাকে কোলে টেনে নিয়ে সে তার চোখের জলে ভেজা গালে নাক ঘষলে, শ‍ু'কে দেখল যেন। 'অনেক ভেবেছি আমি, অনেক ভেবেছি বেটা, যেটুকু ভাবতে পেরেছি সেটুকু তোকে বলি শোন। তুই আমার বড়ো ছেলে, আদরের ছেলে, বলি তোকে, ঐ লাইন-টানা কাগজগ্‌লো থেকে মাথা সরাস না। কেউ যদি তোকে মান্‌ষ করে তোলে তবে সে ঐ খাতা। দেখলি তো কি আমার জীবনে ঘটল — তার একমাত্র কারণ লেখাপড়া জানি না।'

'তোমার দোষ নেই কিছ্‌,' রেগে ফিসফিস করলে সৈয়দ, 'দোষ ওদের... ওরাই... আমি সব জানি।'

'সব নয় বেটা, সব জানিস না। লেখাপড়া যদি শিখতে পারিস, তাহলে বাই আর কাজীদের নাক কেটে ছাড়বি, আমায় ওরা যা করেছে তা করার সাহস যেন না পায় তোর বেলায়... চোখ তোর খ্‌লবে, অন্যদের চোখও তুই খ্‌লে দিবি। সে সাধ্যি আমার নেই, কিন্তু তুই পারবি, তোকে পারতে হবে! নিজের সব শক্তি ঢেলে দে ওই খাতাপত্তরে... এর বেশি আমার কিছ্‌ বলার নেই। মাথায় আমার মগজও নেই, বিদ্যেও নেই যে তোকে দেব।'

বাখতিগুলের ধূসর গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। জলটা মুছে নিলে সে, সৈয়দকে সরিয়ে দিলে।

'এবার যা নিজের খাতাপত্তরের কাছে।'

এই আলাপটার পর থেকে সৈয়দ আর ঘুমের মধ্যে কাঁদত না, চেঁচিয়ে উঠত না।

আফানাসি ফেদোতিচ নিজেও লোকটা হাসিখুশি ফুর্তিবাজ, কখনো মন খারাপ করত না সে। প্রতিদিন সে জেলখানার শুকনো ঘাস ভরা আঙিনায় সৈয়দের হাত ধরে বেড়াত, দৌড়োদৌড়ি করত তার সঙ্গে।

তার সঙ্গেই মিলে সৈয়দ বাপের জন্যে, অন্যান্য বুড়োদের জন্যে জল গরম করে দিত, চা ভারি ভালোবাসত বাপ।

একদিন আফানাসি তার নীল চোখ মটকে জিজ্ঞেস করলে:

'কী ভাবছিস রে সৈয়দ? বসন্ত তো এসে গেল, আউলের জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? বাইরে যেতে চাস? কি রে, চুপ করে রইলি যে?'

ছেলেটা আস্তে মাথা নাড়লে:

'না, আফানাসি-আগা... যেতে চাই না...'

'মিথ্যে কথা! যেতে আবার চাস না!'

'এইখানেই বেশ আছি আফানাসি-আগা... এইখানেই ভালো...'

বাখতিগুল তার ছাই রঙের মোচ কামড়ে হাত দিয়ে গলা চেপে ধরে শুয়ে ছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে।

'বাছা আমার... নয়নের মণি আমার,' ভাবলে সে।

আফানাসি ফেদোতিচ ছেলেটাকে কোলে তুলে বুকে চেপে ধরল। সৈয়দ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে না।

'শুনলে ভায়া কী বলছে? ওরে সৈয়দ, সৈয়দজান! আমি আর নেই, বাপ্!.. আর জানো হে ভয়ঙ্করটা কি? এ সব কথা কিন্তু ও বই থেকে শেখে নি।' এই বলে আফানাসি সৈয়দকে বুকে করেই ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিলে।

এই ভাবেই দিন কাটে ওদের, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। শান্ত, পরিশ্রমী কালো চুলো ছেলেটা লাইন-টানা খাতা ভরায় কম নয়। আফানাসি-আগা তাকে লিখতে শেখায়, হাসতে শেখায়, দেখতে শেখায় এমন কিছু যা তার বাপ দেখে নি — দেখতে শেখায় ভবিষ্যৎ জীবনের আলো।

আর দিন গোনে বাখতিগুল, দিন গোনে, কবে বিচার হবে, রায় বেরবে...

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্‌স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

প্রগতি প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ভাষায় সোভিয়েত বই

আ. মাকারেঙ্কো

বাঁচতে শেখা

আন্তন মাকারেঙ্কো (১৮৮৮—১৯৩৯) হলেন বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষণবিদ ও প্রতিভাশালী লেখক, ইনি তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন সোভিয়েত রাজের প্রথম দিকে। দেশে সে সময় হাঘরে ছেলে ছিল অনেক। নানা জরুরী রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে এই অভিশাপটার বিরুদ্ধে সংগ্রামও আর ফেলে রাখা চলছিল না। শিক্ষণবিদ মাকারেঙ্কো তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন এই হাঘরে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলার কাজে।

পরে মাকারেঙ্কো এই ছেলেমেয়েদের জীবন ও পরিণতি নিয়ে কয়েকটি বই লেখেন: 'জীবনের পথ', 'মা-বাপের বই' এবং উপন্যাস 'বাঁচতে শেখা'। 'বাঁচতে শেখায়' বর্ণনা করা হয়েছে দ্‌জের্জিনস্কি কিশোর শ্রম কমিউনের কাহিনী — মাকারেঙ্কো এটির পরিচালক ছিলেন ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত।

রুশ গল্প সংকলন

চিরায়ত রুশ সাহিত্য

বইটিতে আছে ১৯ শতকের বিশ্ববিখ্যাত রুশ চিরায়ত সাহিত্যিকদের কতকগুলি সেরা গল্প: যেমন, পুশকিনের 'স্টেশনের ডাকবাবু', গোগলের 'সরোচিনেৎসের মেলা', চেখভের 'সাহিত্যের শিক্ষক', লেভ তলস্তয়ের 'বল-নাচের পর', তুর্গেনেভের 'দুই গায়ক' ইত্যাদি।

রুশ গল্প সংকলন

সোভিয়েত সাহিত্য

এ সংকলনে আছে মিখাইল শলোখভ, ইউরি নাগিবিন, সের্গেই আন্তোনভ প্রভৃতি আধুনিক সোভিয়েত গল্পকারদের সেরা রচনা।

প্রত্যেকটি গল্পই বাংলা ভাষায় অনূদিত হল এই প্রথম।

মূর্খতার আউয়েজভ • স্তেপের লেঠেল